কল্পবিজ্ঞানের গল্প জমজমাট

কল্পবিজ্ঞানের গল্প জমজমাট

যোগমায়া প্রকাশনী

৬০ পটুয়াটোলা লেন ॥ কলকাতা-৭০০০০৯

অদৃশ্য চোখ
প্রথম প্রকাশ ॥ ২০ জুন
১৯৫৮ ॥ রথযাত্রা

প্রকাশক ঃ শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ
৬০ পটুয়াটোলা লেন ॥ কলকাতা ৭০০০০৯ এবং
এল. আই. জি. বিল্ডিং ব্লক-সি. ফ্ল্যাট-থ্রি ॥
ফরটি নাইন, নারকেল ডাঙ্গা,
নর্থ রোড ॥ ক্যালকাটা সেভেন ল্যাখ ইলেভেন ॥

প্রচ্ছদ ঃ অঙ্গসজ্জা ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ॥

মুদ্রাকর ঃ শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী পান । জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টিং
ওয়ার্কস ॥ ৩৭/১/২ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড,
কলকাতা-৭০০০০৪ ॥

বাইণ্ডার ঃ দি ক্যালকাটা বাইণ্ডারস ॥

শিবময় দত্ত-কে

লেখকের অন্যান্য বই

খাদানের পরে
খাদান
আকাঙ্ক্ষা
মার্সিয়ান মিস্ত্রি
দিগন্তের সীমানা নেই
সম্ভবামি
বাঁশের বাঁশি
অবগাহন
রাধা
পুণ্যিবালা
বীজ যেমন হয়
চিলির নেরুদা কলম্বিয়ার মার্কেজ
খণ্ড কথা (সম্পাঃ)
ইছামতী থেকে আমাজন (সম্পাঃ)
ঘনশ্যাম চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প
ভিয়েতনামের মজার গল্প

গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি

হাফ ডজন রহস্য
রাত্রির আতঙ্ক
অন্ধকারের হাত
রহস্য জমজমাট
অস্পষ্ট কুয়াশা
অপারেশন এক্স
রহস্যের গোলকধাঁধা
ভয়ঙ্কর দ্বীপের রহস্য
রহস্যঘেরা অরণ্যভূমিতে
অরণ্যে বিষের ছোঁয়া
ছোবল
নেশা
রহস্যবনে
ভয়ঙ্কর রাম্পা

ছোটদের গল্প

রূপকথার ঝাঁপি
সোনা রঙের দিন
গল্প জমজমাট
অপরূপ রূপকথা
একডজন জমজমাট
ইউরোপায় দুরন্ত অভিযান

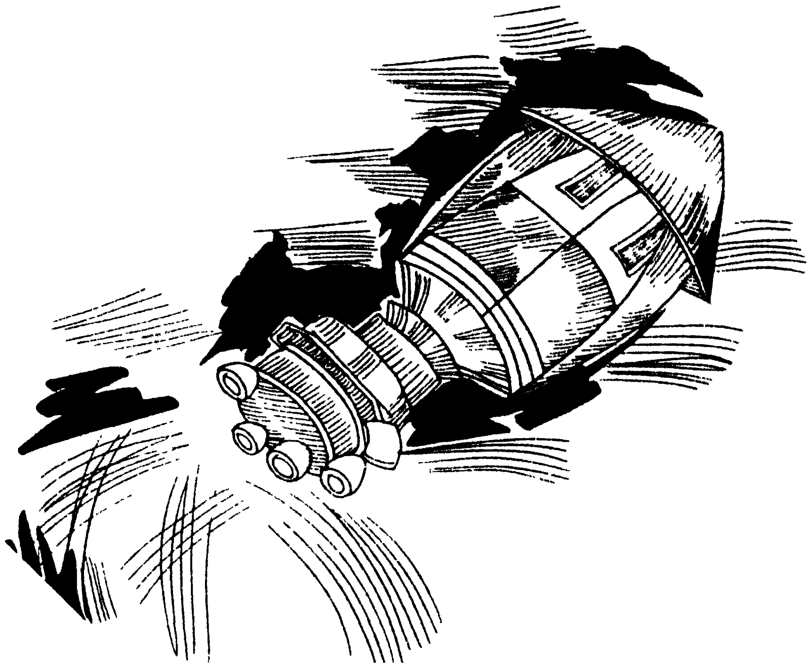
ভূমিকা

গত ক'বছর ধরে নানা পত্রিকায় যখন কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলো লিখলাম, অনেকেই বললেন, তাঁদের বাড়ির খুদেরা নাকি তা পড়ে বেশ মজা পেয়েছে। শুনে আমার বেশ ভালো লাগলো। লিখে ফেললাম কিছু গল্প। বিশেষ করে পাগল বিজ্ঞানী ঝলকমোহন চট্টরাজকে দেখছি সবাই খুব পছন্দ করছে। বাঙালি বিজ্ঞানী। তাও আবার একেবারে ভোলাভালা। মহাকাশ বিষয়ে অপার জ্ঞান। তার সঙ্গে জুটেছে এক সহকারী নাম পারিজাত সেন। সঙ্গে ঝলকমোহনের বাড়ির রাঁধুনি কাম পরিচারক কাম সংসারের পরিচালক লুল্লুরাম। এই তিন চরিত্রকে নিয়ে জমজমাট কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলো। এছাড়াও একটা ব্যাপার থাকে। বিজ্ঞান ছাড়া কল্পবিজ্ঞানের গল্প হয় না। এই গল্পগুলোতে তাই মূল বিজ্ঞানের বিষয়টুকু অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছি। বাদবাকিটা ছোটদের জন্য। কল্পনার ডানায় ভেসে মহাকাশে, দূর গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্রলোকে ভেসে যাওয়া। বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে তাহলে ভেসে যাওয়া যাক অজানা রহস্যের সন্ধানে। দেখা যাক মণিমুক্তো, মাণিক্য কিছু পাওয়া যায় কি না।

ঘনশ্যাম চৌধুরী

সূচি

দুরন্ত অভিযান



মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে যে কাগজে এত লেখালিখি হচ্ছে, এ-ব্যাপারে আপনি কী বলেন? বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ঝলকমোহন চট্টরাজকে এ-প্রশ্ন করায় তিনি একটু মুচকি হাসলেন।

ঝলকমোহনবাবু বাঙালি মহাকাশবিজ্ঞানীদের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্যে একেবারে ঝকমক করছেন এখন। যেমন আকাশের তারাগুলোর ঝিকিমিকি,

তেমনই। মহাকাশের অসীম রহস্যের কথা শুনতে পারিজাত মাঝেমাঝেই তার বাড়িতে যায়। পারিজাত যেন কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করলেও বিজ্ঞানের রহস্য জানতে তার মনটা বড়ো ছটফট করে।

ঝলকমোহনবাবুর এই মুচকি হাসিটাই রহস্যময়। পারিজাত জানে, ওই হাসির আড়ালেই তিনি এক অজানা জগৎকে লুকিয়ে রাখলেন।

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, মঙ্গলে প্রাণ নেই?—পারিজাতের খোঁচা দেওয়া প্রশ্ন শুনে ঝলকমোহনবাবুর ঠোঁট থেকে মুচকি হাসিটা মুহূর্তেই উবে গেলো। তিনি বললেন, প্রাণ নেই, আর প্রাণের অস্তিত্ব নেই, দু'টো কথা মোটেই এক নয়। বুঝলে ছোকরা!

মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছি!—পারিজাত মনে মনে বললো। মুখে সে কিছু বললো না। তাকে নিশ্চুপ দেখে ঝলকমোহনবাবুর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসিটা ফিরে এলো। যে হাসির মানে খুঁজতে পারিজাত দীর্ঘদিন ধরে লড়ে যাচ্ছে।

আমি বলছি, মঙ্গলে প্রাণ নেই! থাকতে পারে না! আর প্রাণের অস্তিত্ব বলতে কী বোঝো হে ছোকরা?

মানে, কোনো এককালে সেখানে প্রাণ...

ওইসব গুলতাপ্পি ছাড়ো! পৃথিবী থেকে ক্যামেরা সাঁটিয়ে মহাকাশ যান পাঠাচ্ছো মঙ্গলের কক্ষপথে। তার পাঠানো ছবি দেখে তুমি মাঝে মাঝে জিগির তুলছো, মঙ্গলে মহাসমুদ্র ছিলো। মঙ্গলে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। যত্তো সব ছাতার মাথা!

তা হলে আপনি কি বলতে চান, সৌরজগতের কোনো গ্রহ বা উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের ব্যাপারটা ভাবা আজগুবি?

না। এমন কথা আমি মোটেই বলতে চাই না।

তা হলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কোথাও না কোথাও?

এই জিজ্ঞাসায় সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে ঝলকমোহনবাবু ফের সেই রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, তোমার হাতে ঘন্টা দেড়েক সময় আছে?

পারিজাত বললো, এক ঘন্টা কেন, সারাদিন ধরেও আপনার কথা শুনতে রাজি আছি।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু সারাদিন ধরে আমার কাছে বসে থাকলে, আমার গাঁটের কড়ি খরচা করে তোমাকে তো আবার খাওয়াতে হবে!

তা একটি বেকার ছেলের জন্য এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর না হয়, কিছু টাকা

খরচই হলো।

হা-হা-হা-হা!

উচ্চগ্রামে অট্টহাসি হেসে ঝলকমোহন চট্টরাজ বললেন, ঠিক হ্যায়! আপাতত চা -সিঙাড়া খাও। তার পর তোমার বেকারত্ব ঘোচাতে মহাকাশযানে চেপে বেরিয়ে পড়া যাবে।

ঝলকমোহনবাবুর পরিচারক কাম বাগানের মালি কাম বিজ্ঞান-গবেষণাগারের সহায়ক লুল্লুরাম দুটো প্লেটে চারটে সিঙাড়া আর দু'কাপ চা দিয়ে গেলো। পারিজাত দেখলো, লুল্লুরামের চোখ-মুখে বিরক্তি। এবং সেই বিরক্তি চেপে না রেখেই সে বললো, সক্কাল থেকে ন'বার চা হয়ে গেল। এভাবে চললে পেটে একেবারে চড়া পড়ে যাবে।

তা যাক।—হাসিমুখে উত্তর দিলেন বিজ্ঞানী।

পারিজাত বুঝলো, লুল্লুরাম একেবারে খেপে লাল হয়ে আছে।

ঝলকমোহনবাবুর বাড়িটি প্রায় চার বিঘে জমির ওপর। সামনের গেটে ঢুকতেই দুপাশে ফুলের বাগান। তাই ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা চারদিক। হাত কুড়ি এগিয়েই মূল দালানের গ্রিলের বারান্দা। দোতলা বাড়ি। ছাতে অবশ্য দুটো ঘর আছে।

বাড়ির পেছনে বিঘে তিনেক খালি জমিতেই তাঁর যত বিজ্ঞানকর্মের ব্যাপার-স্যাপার। এখানে আছে নানা ভেষজ গাছের উদ্যান। থানকুনি, কালমেঘ, হরিদ্রা, গাঁদাল, নিম, পুদিনা, অর্জুন, হরিতকি, বহেড়া, আমলকি, নয়নতারা, তুলসী এমনই ছোট-বড় অজস্র ভেষজ গাছ। বাড়ির চারপাশে তিন মানুষ সমান পাঁচিল। বাড়ির পেছনে ছড়ানো তিন বিঘে জমির ডানদিকে ভেষজ উদ্যান। বাঁদিকে রিসার্চ সেন্টার। স্টিলের খাঁচার ওপর ফাইবার শিটের ছাউনি দেওয়া অর্ধাচন্দ্রাকৃতি এই গবেষণাকেন্দ্রের চারপাশটা অ্যাসবেস্টাসের বেড়া দেওয়া। গবেষণাকেন্দ্রের ভেতরেও লম্বাটে ধরনের বেশ বড় দুটো পাকা ঘর আছে। এটাকে ঝলকমোহনবাবু তাঁর গবেষণাগারের 'তথ্যকেন্দ্র' বলেন। সত্যিই, এখানকার আলমারি আর র‍্যাকগুলো নানা তথ্যের ফাইলে ঠাসা।

এর আগে একদিন ঝলকমোহনবাবু পারিজাতকে এখানে নিয়ে এলেও কিছু একটা দেখাননি। আজকে ভেষজ উদ্যানের পাশের গবেষণাকেন্দ্রে পারিজাতকে নিয়ে গেলেন তিনি। এবার লম্বাটে ঘরটার অর্থাৎ তথ্যকেন্দ্রের তালা খুলে সেখানে ঢুকলেন। সুইচ টিপলেন। আলো জ্বললো।

বিশেষভাবেই তৈরি ঘরদু'টো। প্রথম ঘর পেরিয়ে দ্বিতীয় ঘরে গেলেন

বিজ্ঞানী। বললেন, পারিজাত এসো। তোমাকে এক অজানা জগতে নিয়ে যাবো। দারুণ সেই জগৎ! যদি এই জগতে যাও, তো তোমার বেকারত্ব ঘুচলেও ঘুচতে পারে।

তিনি পটাপট অনেক ক'টা সুইচ টিপলেন। ঘরে এক অদ্ভুত ধরনের আলোকিত পরিবেশ তৈরি হলো। সামনের দেওয়ালে দেখা গেল কৃত্রিম মহাকাশের আলো-আঁধারি খেলা।

এই হলো সৌরজগৎ। মাঝখানে সূর্যকে রেখে দেখো, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল—এই যে এবার সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। —বলেই ঝলকমোহন ফের একটা সুইচ টিপলেন। দেওয়াল থেকে সূর্য আর তার কক্ষপথে ঘুরতে থাকা গ্রহগুলো নিমেষে অন্তর্হিত হলো। ঝলকমোহনবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো পারিজাত।

এবার দেখো বৃহস্পতির জগৎ।

বলতে বলতেই সেই দেওয়াল জুড়ে দেখা দিলো বিরাট গ্রহ বৃহস্পতি।

বৃহস্পতির চারধারে পাক খাচ্ছে, ওগুলো কি গ্রহ নাকি?— পারিজাতের প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানী বললেন, এগুলো দেখাবার জন্যই তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।

কয়েক মুহূর্ত থেমে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন।

সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির গোটা পঞ্চাশেক উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর মাত্র একটিই। তা হলো চাঁদ। চাঁদে প্রাণ নেই এই সত্য আজ প্রমাণিত। কিন্তু বৃহস্পতির এক গুচ্ছ উপগ্রহের চরিত্রে নানা রহস্য গিজগিজ করছে। বৃহস্পতির দু'চারটে উপগ্রহের নাম বলতে পারবে না কি হে?

দু' একটার নাম মনে আছে বোধহয়।

বলো শুনি।

এই ধরুন, আইও, ক্যালিসেটা, গ্যানিমিড, ইউরোপা—

ইয়াস! ইউরোপা! — চিৎকার করে উঠলেন বিজ্ঞানী। এই ইউরোপাকে নিয়েই ভাবছি আমি। আমি জোর গলাতেই বলতে চাই, ইউরোপায়ে আছে বিপুল পরিমাণ জলের সমাহার। আছে প্রাণের অস্তিত্ব।

এই অন্য ঝলকমোহন চট্টরাজকে আজ দেখতে পেলো পারিজাত। তাঁর চোখদুটো এখন ভাঁটার মতো জ্বলছিলো। নিজের চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি এমন জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলেন, যে, তাঁর উস্কোখুস্কো চুলগুলো কপালের নিচে চোখের ওপর আছড়ে পড়ছিলো। আর এক ঝাঁকুনি

দিয়ে তিনি চুলগুলো সরিয়ে নিচ্ছিলেন। ক্রমশ যেন উন্মাদ হয়ে উঠছিলেন প্রবীণ মানুষটি। পারিজাত একটু ঘাবড়ে গেলেও সে বুঝতে পারছিলো, আজকেই তাঁর কাছ থেকে জানা যাবে না-জানা অনেক কথা।

দুই

ঝলকমোহন চট্টরাজের মুখ থেকে তখন জলস্রোতের মতো কথা বেরিয়ে আসছে।

ইউরোপা হতেই পারে দ্বিতীয় পৃথিবী।

বলেন কী!

হ্যাঁ। আমি তাই-ই বলছি! সেখানে আছে অফুরন্ত জল। আছে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। যখন তখন অগ্নুৎপাত ঘটে সেখানে।—বলেই তিনি ফের একটা সুইচ টিপলেন।

হঠাৎ অন্ধকার নেমে এলো ঘরে। বিজ্ঞানী বললেন, চলো পারিজাত। অসীম মহাকাশের লক্ষ কোটি আশ্চর্য বিষয়ের সামান্য কিছু দেখে আসি।

বিজ্ঞানীর পিছু পিছু চললো পারিজাত। লম্বাটে এই ঘরটির ওপরে ওঠার জন্য ঘোরানো সিঁড়ি ধরে দুজন একেবারে ছাতে। ছাতের ওপর ত্রিপলে ঢাকা বেশ বড় একটা গোলাকার বস্তুর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

বলতে পারো এটা কী?

না।—মাথা নাড়লো পারিজাত।

এই কথা শুনে মুচকি হাসলেন বটে ঝলকমোহনবাবু, তবে তাঁর চোখে সেই আগুন দৃষ্টি ছিলোই। দারুণ কৌতূহল নিয়ে পারিজাত অপেক্ষা করছিলো নতুন কিছু শোনার জন্য।

লম্বা লম্বা দু'পা ফেলে ঝলকমোহন দাঁড়ালেন সেই ঢাকা বস্তুটির সামনে। পকেট থেকে বার করলেন একটা চাবির গোছা। ত্রিপলের বিভিন্ন অংশের লোক চাবি ঢুকিয়ে লক খুলে ত্রিপলের জোড়গুলো আলগা করে ফেললেন তিনি। ত্রিপল দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে নেমে গেল। দেখা গেল গ্রামবাংলার কৃষকের বাড়ির ধানের গোলার মতো একটি বস্তু। মাথাটি রকেটের মতো ছুঁচলো।

এটা আমার বানানো স্পেস ক্যাপসুল।

অ্যাঁ! হ্যাঁ—মানে এটা কোনো স্পেস ক্যাপসুলের মডেল তো?

মডেল হতে যাবে কেন! এটা সত্যিকারের মহাকাশযান। এর গতি আলোর গতির প্রায় আধাআধি।

পারিজাত মানুষটার এ-সব কথা শুনে ভাবছিল, ঝলকমোহনবাবু মহাকাশ নিয়ে সবসময় চিন্তা করতে করতে নিশ্চয়ই আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখছেন। না হলে এ-বাড়ির ছাতে মহাকাশযান বানিয়ে ফেলেছেন—এমন আজগুবি কথা বলেন কী করে!

কি ছোকরা? বিশ্বাস হচ্ছে না তো!—ফের সেই মুচকি হাসি।

না না। আমি ঠিক এমন ভাবছি না। আমি—

শোনো ছোকড়া! তুমি যা-ই ভাবো না কেন, কালকে বিকেল চারটেয় ছ'ঘন্টা সময় নিয়ে তুমি চলে এসো এখানে। টাইম ক্যাপসুলে চাপিয়ে ইউরোপা থেকে ঘুরিয়ে রাত দশটার মধ্যে তোমাকে পৃথিবীতে পৌঁছে দেবো।

এবার একটা প্রশ্নই শুধু করলো পারিজাত।

আচ্ছা, আপনার এই স্পেসশিপ চলবে কীসে?

যুক্তিসম্মত প্রশ্নই তুমি করেছো। আমি ভেষজ গাছের পাতা থেকে তৈরি করেছি চূড়ান্ত এনার্জি। সেই এনার্জি সংহত করা হয়েছে হারবাল ব্যাটারিতে। সেই শক্তির তেজের কথা কল্পনা করতে পারবে না একুশ শতকের বিজ্ঞানীরা। ওঁদের আরো পাঁচশো বছর হাঁটতে হবে।

পারিজাত ইচ্ছে করেই আর কোনো প্রশ্ন তুললো না। শুধু বললো, কালকে বিকেলে চলে আসছি আমি।

এবার অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছেন ঝলকমোহন চট্টরাজ। সহজভাবে হেসে বললেন, দ্যাখো, ইউরোপাতে গিয়ে তোমার বেকার সমস্যার কিছু সমাধান করা যায় কি না।

কী রকম?

ইউরোপার জল সম্পর্কে আমি যা জেনেছি তাতে গলদা চিংড়ির প্রচুর উৎপাদন সম্ভব। এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে শুধু গলদা চিংড়ির ডিম। ইউরোপার জলাশয়ে সেই ডিম ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। প্রথমে তোমাকে ছ'মাস অপেক্ষা করতে হবে। সেই ডিম থেকে চিংড়ি বড় হবে। সেই চিংড়িগুলো ডিম পাড়তে শুরু করলেই কেল্লা ফতে। তুমি শুধু পনেরো দিন অন্তর অন্তর যাবে আর স্পেপশিপের মালবাক্সোতে করে কয়েক হাজার কিলোগ্রাম সেরা জাতের গলদা নিয়ে আসবে পৃথিবীতে। বিশ্ব-বাজারে চিংড়ির

একচেটিয়া কারবার করবে তুমিই।

আচ্ছা দেখা যাবে। কাল আমি আসছি, বলে পারিজাত বললো, চলুন, তাহলে নিচে যাই।



তিন

পরের দিন সকাল থেকে পারিজাতের সময়গুলো যে কীভাবে কেটে গেল, গুছিয়ে মনেই করতে পারলো না সে! ওর মন পড়ে রয়েছে সেই স্পেস শাট্‌লে, যেটা ঝলকমোহন চট্টরাজ্যের তথ্যকেন্দ্রের ছাতে অবস্থান করছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজ বিকেলে কীভাবে যে সে বিজ্ঞানীর বাড়ি

পৌঁছে গেল, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। আজ সারা বাড়ি অন্ধকার। বারান্দার গ্রিল খুলে ভেতরে ঢোকামাত্র কোথা থেকে যেন ঝলকমোহনের গলা ভেসে এলো—

পারিজাত, শুনতে পাচ্ছো? তুমি সোজা পথ ধরে হেঁটে আমার গবেষণাগারের তথ্যকেন্দ্রে চলে এসো।

তাই করলো সে। ভেষজ উদ্যানের পাশের রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়ে বাঁ দিকে ফাইবারের ছাউনি দেওয়া সেই অর্ধাচন্দ্রাকৃতি রিসার্চ সেন্টারে ঢুকে পড়লো।

এই যে পারিজাত, এসো, আমরা দেরি না করে এক্ষুনিই ইউরোপার দিকে রওনা দেবো।

ঝলকমোহনবাবুকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল পারিজাত। মহাকাশচারীদের পোশাক তাঁর পরনে। তিনি বললেন, এসো, তথ্যকেন্দ্রের ভেতরে এসো। তোমাকেও স্পেসস্যুট পরে নিতে হবে।

তথ্যকেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে সে নিমেষের মধ্যে স্পেসস্যুট পরে নিলো। প্রত্যেকটি ব্যাপার এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিলো যে, পারিজাতের চিন্তা একটা জায়গায় থেমে থাকতে পারছে না! সে অবাক হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে ভাববার সময় পাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় ঘটনা চলে আসছে।

স্পেসস্যুট পরে নিজেকে অসম্ভব হালকা লাগছিলো পারিজাতের। সে কিছু বলতে চাইছিলো ঝলকমোহনবাবুকে। কিন্তু বলতে পারছিলো না। সে মনে মনে ভাবছিলো, কেন আমি কথা বলতে পারছি না? আশ্চর্য তো! সে অবশ্য ঝলকমোহনের কথা শুনতে পাচ্ছিলো একেবারে পরিষ্কার। ওরা এখন তথ্যকেন্দ্রের ছাতে। ধানের গোলার মতো দেখতে অদ্ভুত ধাতু দিয়ে তৈরি মহাকাশযানের দরজা খোলা। ভেতরে নীলাভ আলো। ঝলকমোহনবাবু বললেন, পারিজাত, উঠে পড়ো।

সম্মোহিতের মতো তাতে উঠে পড়লো পারিজাত। উঠলেন বিজ্ঞানীও। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঝলকমোহন বললেন, হারবাল ব্যাটারিতে যে স্পেস শাট্‌ল চলে, তার কোনো শব্দ হয় না। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে গাড়িঘোড়া চালাতে হারবাল ব্যাটারি ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। তখন আর তেলের জন্য অন্য দেশ আক্রমণ করে নারী-শিশুসহ হাজার হাজার মানুষকে খুন করতে হবে না দস্যু দেশগুলোকে।

শুধু একটু ঝাঁকুনি। ঝলকমোহন একটা সুইচ টিপলেন মাত্র। পারিজাতের শরীর আরো হালকা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করলেই সে এখন বাতাসে ভাসতে পারবে।

আমাদের যান ছুটছে। এখনো পৃথিবীর অভিকর্ষ এলাকার মধ্যেই আছি আমরা। আর তিরিশ সেকেন্ড। —হ্যাঁ। এবার আমরা বন্ধনমুক্ত। পৃথিবীর কক্ষপথ পেরিয়ে সূর্যকে পেছনে রেখে আমরা এখন বৃহস্পতির কক্ষপথের দিকে ছুটে চলেছি। পারিজাত, তুমি কি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখতে চাও? তবে উইন্ডো গ্লাসের কভার খুলে দেবো। —এতগুলো কথা বললেন ঝলকমোহন।

স্পেসস্যুটের জন্যই কি না, কে জানে, পারিজাত কথা বলতে পারছিলো না। তবু ঘাড় নেড়ে সে সম্মতি জানালো।

সুইচ টিপলেন ঝলকমোহন। দু'দিকে ডানার মতো খুলে গেল উইন্ডো গ্লাসের কভার।

কী অসাধারণ দৃশ্য! চিৎকার করে উঠতে চাইলো পারিজাত। পারলো না। ডান দিকের জানালা দিয়ে খুব কাছেই একটা গ্রহ দেখা যাচ্ছিলো। বিজ্ঞানী বললেন, ওটা চাঁদ। চাঁদের অভিকর্ষ এড়িয়ে তার পাশ দিয়েই আমরা ছুটছি।

অসীম মহাকাশের দিকে তাকিয়ে নানা রকম বিচিত্র অনুভূতিতে মন ভরে গেল পারিজাতের। কী বিশাল এই জগৎ। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যেখানে ক্ষুদ্র চিন্তা নেই। নেই ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কোনো ঝঞ্ঝাট। নক্ষত্র, ছায়াপথ, সূর্য গ্রহ-উপগ্রহগুলো এক অলিখিত নিয়মে শৃঙ্খলা মেনে তার কক্ষে অবস্থান করছে, অথবা ঘুরে চলেছে।

ফের শোনা গেলো ঝলকমোহনবাবুর কণ্ঠস্বর।

পারিজাত, এবার কিছুক্ষণের জন্য আমরা চাঁদের রাতের অংশে থাকবো। অর্থাৎ সূর্য এখন ঠিক চাঁদের পেছন দিকে আছে। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। আমাদের স্পেস শাটল প্রায় আলোর গতির আধাআধি। এক্ষুনি সে মঙ্গলের কক্ষপথের কাছাকাছি চলে যাবে।

পারিজাত বাইরের দিকে তাকিয়েই ছিলো। ধীরে ধীরে বিকেল থেকে সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা থেকে গভীর রাতের মধ্যে চলে এলো তাদের যান। দূর মহাকাশে অজস্র নক্ষত্রের ভিড় দেখা গেলো। কিন্তু তাও প্রায় মিনিট কুড়ির ব্যাপার। খানিকক্ষণের মধ্যেই ভোরের আলো, সকালের স্নিগ্ধতা পেরিয়ে ফের ঝকমকে আকাশ এসে গেলো।

যানের ভেতরটা অপরিসর; বেশি হাঁটাচলার সুযোগ নেই। তারই মধ্যে

ঝলকমোহন যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে পারিজাতের কাছে এলেন। পারিজাতের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও পারিজাত তাঁর স্পর্শের কোনো অনুভব পাচ্ছিলো না। মাঝে মাঝে এইসব কান্ডে সে অবাক হচ্ছিলো ঠিকই, তবে মহাকাশের আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে দেখতে সে অবাক হচ্ছিলো তার চেয়েও বেশি। ঝলকমোহনবাবুর চোখও বাইরের দিকে। একটা বিন্দুর মতো বস্তুর দিকে তিনি তর্জনি তুলে দেখালেন।

ওই দ্যাখো, ওটা মহাকাশের একান্ত নিজস্ব কিছু নয়। ওটা পৃথিবীর কোনো দেশের পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহ। ওটা মঙ্গলের চারপাশে ঘুরে মঙ্গলের ছবি তুলে যাচ্ছে সমানে। তবে তাতে কাজের কাজ কিস্‌স্যু হবে না। মঙ্গলে কিছু নেই—বলে মুখ বেঁকালেন বিজ্ঞানী।

পারিজাত দেখলো, নিমেষেই সেই বিন্দুটি হারিয়ে গেল।

ঝলকমোহন বললেন, মঙ্গলের কক্ষপথ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি আমরা। তাই আমাদের যানের গতি আরো বেড়েছে। শনি আর শনির বলয় আমরা দেখতে পাবো না। শনির বার্ষিক গতিতে সে রয়েছে সূর্যের অপর দিকে।

যানের জানালার বাইরে এই যানের পাখা, এরিয়াল, দূরবীক্ষণ-ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছিলো পারিজাত। হঠাৎ বেশ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো তাদের মহাকাশ ফেরী যান। পারিজাত তাতে চমকে গেলেও মুচকি হাসলেন ঝলকমোহন।

বৃহস্পতির কক্ষপথে ঢুকে পড়েছি আমরা। তাই আমাদের ফেরীর গতি শ্লো হয়ে গেলো অটোমেকি্যালি। তবে আমরা বৃহস্পতির অভিকর্ষের আওতায় যাবো না। বড় গ্রহ, তার টানও সাঙ্ঘাতিক। আমরা দূর থেকে বিশাল গ্রহ বৃহস্পতিকে বহুক্ষণ দেখতে পাবো। এখন আমাদের গন্তব্য হলো ইউরোপা। উইন্ডো গ্লাসের বাইরে নজর রাখো পারিজাত।

তাদের ফেরীর জানালা দিয়ে অনন্ত-অসীম মহাকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিলো পারিজাত। বাইরে বিপুল শূন্যতা। না দিন, না রাত্রির মতো।

হঠাৎ এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলো পারিজাত। বাইরেটা ক্রমশ আলোকিত হয়ে উঠছে। প্রায় দিনের মতো আলো।

ঝলকমোহন চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমরা বৃহস্পতির দিনের অংশ দিয়ে ছুটে চলেছি! ডান দিকে তাকাও পারিজাত!

দূরে বিশাল থালার মতো বৃহস্পতিকে দেখা গেল। সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময় পৃথিবী থেকে সূর্যকে যেমন লাগে, বৃহস্পতিকে লাগছিলো তার থেকে দশ গুণ বড়ো। মনে হচ্ছে, খুব কাছেই রয়েছে ওটা। ম্যাটমেটে লাল তার শরীর।

ঝলকমোহন বললেন, সূর্যের অনেক দূরে বৃহস্পতির কক্ষপথ। বৃহস্পতিতে সূর্যের আলো পৌঁছতে পৌঁছতে তার তীব্রতা অনেকটা মিইয়ে যায়। তাই বৃহস্পতির দিনের আলো পৃথিবীর মতো নয়। একটু ম্যাড়মেড়ে। দ্যাখো পারিজাত, বিশাল বৃহস্পতি গ্রহকে দ্যাখো! এর চারদিকে ঘুরছে ষোল বিড়ো বড়ো উপগ্রহ। এছাড়াও আরো গোটা পঁয়ত্রিশেক ছোটো ছোটো চাঁদ আছে, ভাবতে পারো! তার মধ্যে ইউরোপায় পৃথিবীর অধিকাংশ চরিত্রই বর্তমান।

চার

ঝলকমোহনের মহাকাশযান গোলমালে পড়লো ইউরোপার কক্ষপথে ঢুকে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিপদ্ধতিতে তৈরি এই যান কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে সরাসরি সেই গ্রহের মাটিতে নেমে আসতে পারে। ফেরীযানটি কক্ষপথের আবর্তনচক্র থেকে সামান্য পিছলে গিয়ে ইউরোপার অভিকর্ষের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এবার সে সবেগে নিচে নামছে। ঝলকমোহন বললেন, ইউরোপায় মাধ্যাকর্ষণের টানে আমাদের গতি এখন প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে আটশো কিলোমিটার। গ্র্যাভিটি বুস্টিং বা স্লিং শটের জন্যই এই গতি। অতএব এক্ষুনি যানের স্পিড-কন্ট্রোল করতে হবে।

তিনি সুইচবোর্ডের কাছে গেলেন ভাসতে ভাসতে। নানা রকম বোতাম টিপলেন।

ঠিক তক্ষুনি সেই শূন্যে কোনো একটা বস্তু এই যানের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল সাঁ করে। পারিজাত দেখলো, এই ঘটনায় ঝলকমোহনবাবুর মতো অভিজ্ঞ মানুষও চমকে গেলেন। তাঁর চোখে-মুখে আতঙ্ক। তিনি তড়িঘড়ি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাচে চোখ রাখলেন। পাশাপাশি ডান হাত দিয়ে একটা লিভার এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছিলেন তিনি। তারপর তাঁর প্রায় আর্তচিৎকার শোনা গেল।

অসম্ভব কাণ্ড! হুবহু আমারই মতো স্পেস শাট্‌ল বানিয়ে কেউ ইউরোপার কক্ষপথে চলে এসেছে! আবার আমাদের দিকে গোলাও ছুঁড়ছে। কে চুরি

করলো আমার ফর্মুলা? কে আমার তৈরি মহাকাশ-মানচিত্রপথ ধরে ইউরোপায় চলে এলো?

পারিজাত জানালা দিয়ে এবার দেখতে পেলো হুবহু ধানের গোলার মতো দ্বিতীয় মহাকাশযানটিকে। সেটার কামানোর মতো নল দিয়ে ফের একটা আগুনের গোলা ছুটে আসছে। ঝলকমোহন দ্রুত যানের গতিপথ ঘুরিয়ে নিলেন। গোলাটা অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দু'টো যানই ইউরোপের মাটিতে নামার জন্য ছুটছে। নব্বই ডিগ্রি কোণে যানের গতিমুখ কায়দা করে ঘুরিয়ে দিয়ে ঝলকমোহন প্রতিদ্বন্দ্বী যান থেকে নিজেকে এক থেকে দেড় হাজার কিলোমিটার তফাতে নিয়ে গেলেন। ঝলকমোহনের কথা শুনতে পেলো পারিজাত।

আমরা ইউরোপার ঠিক চার কিলোমিটার ওপরে আছি। এবার আর সোজাসুজি নয়, হেলিকপ্টারের মতো গতি নিয়ে সেভাবেই ল্যান্ড করবো আমরা। পারিজাত, ওই দ্যাখো ইউরোপার জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। দ্যাখো, সমানে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে চলেছে। আমরা এই মুহূর্তে ইউরোপার পৌনে দু'কিলোমিটার ওপরে চলে এসেছি। দেখো, বলেছিলাম না, ইউরাপায় মহাসমুদ্র আছে। দেখতে পাচ্ছো জলময় গ্রহ?

পারিজাত উচ্ছ্বসিত। কিন্তু কেন যে সে কথা বলতে পারছে না কে জানে! সে দেখলো উপগ্রহের বেশিরভাগ অংশই জলময়। পৃথিবীর মতো তিন ভাগই কি জল এখানে?

সে ভাবছিলো, জল আছে, কিন্তু তরঙ্গ নেই কেন? ঢেউ নেই কেন? ঝলকমোহন বোধহয় তার মনের কথা ধরতে পেরেছেন। বললেন, পারিজাত, তুমি স্পেকট্রাস্কোপে চোখ রাখো।

পারিজাত সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নলে চোখ রাখলো। দেখলো, জল নয়, ঘন তুষার জমে আছে স্তরে স্তরে।

ঝলকমোহনের মুখে ফের সেই মুচকি হাসি।— তা হলে যুবক, বরফের মধ্যে তুমি কী করে গলদা চিংড়ির চাষ করবে? চলো, একা ডাঙা এলাকা দেখে আমার ল্যান্ড করি।

বিজ্ঞানী বোতাম টিপে গতি বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ফেরী যানের। ইউরোপের আধ কিলোমিটার উঁচু দিয়ে সাঁ-সাঁ করে যান ছুটে চললো।

তারপর হঠাৎই হুঁশ করে নিচে নেমে দাঁড়িয়ে পড়লো সেটা। এক্কেবারে নিমেষের মধ্যে!

ঝলকমোহনের পিছু পিছু পারিজাত ইউরোপার মাটিতে এসে দাঁড়ালো। ওরা একেবারে ভেসে না বেড়ালেও শরীরটা এতই হালকা লাগছিলো, যে, ওদের মনে হচ্ছিলো, হাতদুটো পাখার মতো ছড়িয়ে উড়ে বেড়ালেই হয়।



হিম ঠান্ডা পরিবেশ। স্পেসস্যুটের মধ্যেও তা মালুম হচ্ছিলো। ঝলকমোহন বললেন, বৃহস্পতির থেকে অবশ্যই বেশি সূর্যের তাপ পড়ে ইউরোপায়। কিন্তু তা তো আর পৃথিবীর মতো নয়! ফলে ওপরের স্তরে জল পাওয়া দুষ্কর।

পারিজাত চারদিক দেখছিলো। তুষার অঞ্চলের সর্বত্র ঘন সবুজ শ্যাওলা জাতীয় গাছ। ম্যাড়মেড়ে আলোয় তা খানিকটা কালো লাগছে। একটা বেশ

বড়সড় তুষারময় জলাশয়ের পাশেই ওদের মহাকাশযান এসে নেমেছে।

প্রায় ভাসতে ভাসতে ঝলকমোহন তখনই সেই জলাশয়ের পাড়ের দিকে চলেছেন। পারিজাত দেখলো তিনি জলাশয়ের তুষারজমির পাশে বসে তুষারে হাত রাখছেন। খানিকক্ষণ দেখে তিনি ফের প্রায় ভাসতে ভাসতে ফেরীযানের কাছে গেলেন। সেটার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন হাতে সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র আর চকচকে দেখতে অদ্ভুত ধাতুর তৈরি একটা শাবল নিয়ে। ইশারায় ডাকলেন পারিজাতকে। পারিজাত এগিয়ে গেল। ততক্ষণে জলাশয়ের শক্ত তুষারের ওপর বসে তিনি সেই শাবল দিয়ে তুষারে ঘা মেরে গর্ত করতে শুরু করেছেন। ছিটকে উঠে বরফের টুকরোগুলো অনেকটা ছেঁড়া কাগজের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো।

হাত দুয়েক গর্ত খুঁড়ে তিনি পারিজাতকে বললেন, স্পেকট্রাস্কোপের মুখটা এই গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দাও।

তাই করলো পারিজাত। এবার নলের মাথায় চোখ রাখলেন ঝলকমোহন। নলের গায়ে বিভিন্ন বোতাম টিপে নানাভাবে ঘুরিয়ে তিনি কিছু বোঝবার চেষ্টা করছিলেন।

মিনিট পাঁচেক নানা ভাবে দেখে তিনি মুখ তুললেন। পারিজাতের চোখে প্রশ্ন। বিজ্ঞানী বললেন, সামান্য নিচেই আছে আমাদের জন্য দারুণ মূল্যবান নোনা জল। বুঝলে পারিজাত, আমার এই বহুমুখী যন্ত্র সেই জলে সিগনেচার অব লাইফের সিগনাল দিচ্ছে। দেখছি, সেই জলে মুক্ত অক্সিজেন আছে। আছে অল্প মিথেনও। আমার যন্ত্র এই জলে প্রিমিটিভ লাইফ থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লাইফেরও জানান দিচ্ছে।

পাঁচ

কথা বলতে বলতেই বিজ্ঞানী হঠাৎ চমকে উঠলেন। সতর্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে চারধার দেখতে শুরু করলেন। স্পেকট্রাস্কোপটা হাতে তুলে নিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে তার কাচে চোখ রাখলেন। শেষ পর্যন্ত কিছু একটা দেখে চিৎকার করে বললেন, ওটা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওপরে তাকিয়ে একটা কালো বিন্দু দেখতে পেলো পারিজাত। অনেকটা পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের বুকে শুক্রের সরণের মতো। বিন্দুটা আকাশের ডান দিকে সরে যাচ্ছিলো। তাই দেখে ঝলকমোহন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বললেন, যাক, ব্যাটা উজবুকটা আমাদের দেখতে পায়নি।

বলেই ঝলকমোহন স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে প্রায় কুড়ি ফুট শূন্যে ওপরে উঠে গেলেন। ভেসে ভেসে নামতে মিনিট দুয়েক সময় লেগে গেল। নামলেন দাঁড়িয়ে থাকা যানের দরজার কাছে। ঢুকে পড়লেন তাতে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফের বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা জলভর্তি পলিথিন প্যাকেট। চললেন জলাশয়ের দিকে। বললেন, পারিজাত, শাবল দিয়ে বরফের ওই ফোকরটা আরো একটু বড়ো করো।

পারিজাত তাই করলো। পলিথিন প্যাকেটটা ততক্ষণে খুলে ফেলেছেন ঝলকমোহন। এবার তিনি হাসি হাসি মুখে বললেন, তোমার বেকারত্ব ঘোচাবার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। এই প্যাকেটে পঞ্চাশ লক্ষ গলদা চিংড়ির ডিম আছে।

প্যাকেটের সমস্ত ডিম বরফের সেই গর্তের মধ্যে ঢেলে তিনি জলাশয়ের নিচের নোনা জলে চালান করে দিলেন। এবার তিনি তাঁর স্পেস স্যুটের পকেট থেকে একটা ছোট রেডিওর মতো বস্তু বের করলেন। সেটার ঢাকনাটা খুলে ভেতরকার সবকিছু খুঁটিয়ে দেখলেন। বন্ধ করলেন ঢাকনা।

এটা হারবাল ব্যাটারিতে চলা দারুণ শক্তিশালী ট্রান্সমিটার। সবরকম ওয়েদার সহ্য করার ক্ষমতা আছে এটার। চিংড়িগুলো বেঁচে আছে কিনা, কিংবা তাদের বৃদ্ধি অথবা সংখ্যা, সবকিছুই সে এই জলাশয়ে বসে হিসাব করবে। এটা হচ্ছে আমার তৈরি হারবাল মিনি রোবট কম্পিউটার কাম ট্রান্সমিটার।

ঝলকমোহনবাবু ট্রান্সমিটারের দুটো বোতাম টেপামাত্রই সেটির সারা শরীর জুড়ে অবুজ আলো জ্বলে উঠলো। মুচকি হাসলেন ফের ঝলকমোহন। বললেন, এই যে এটি চলতে শুরু করলো, আর তা থামবে না। পৃথিবীতে আমার রিসার্চ সেন্টারে এই যন্ত্র নিয়মিত খবর পাঠিয়েই যাবে। আর ভবিষ্যতে আমরা যখন ফের মহাকাশযান নিয়ে ইউরোপায় আসবো, এই যন্ত্রই আমাদের এই জলাশয়কে ইন্ডিকেট করে দেবে। না হলে হাজার হাজার জলাশয়ের মধ্যে এটাকে আমরা চিনবো কেমন করে?

বলেই ঝলকমোহন সেই যন্ত্রটা বরফের গর্ত দিয়ে জলাশয়ের জলে ফেলে দিলেন। তারপরই বললেন, আর দেরি নয়। এবার সোজা পৃথিবীর দিকে। আমাদের টাইম পাস হয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষা করবো না আর এক মুহূর্তও। চলো জলদি!

ছয়

ইউরোপা থেকে ফেরীযান ছুটে চলেছে পৃথিবীর দিকে। ঝলকমোহন বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। পাশ থেকে পারিজাতও দেখছিলো বৃহস্পতির জগৎ।

হঠাৎ ফেরীযানে প্রবল ধাক্কা। যানটি একেবারে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে উঠলো। এই বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে! পারিজাত আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু কোনো স্বর বেরলো না ওর গলা থেকে। যানটা একটু ধাতস্থ হলো। পারিজাত দেখলো, ঝলকমোহন প্রথম ধাক্কায় ভয় পেয়ে গেলেও এবার ধীরে ধীরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

আমার ফর্মুলা নকল করে আমাকেই মারার চেষ্টা। দেখাচ্ছি মজা! কিন্তু ও তো জানে না, লেজার রশ্মির মাথায় গোলা রেখে ছুঁড়লে এই যানের কিস্‌সু হবে না। যানের শরীরে যা লেপে দিয়েছি, সে ফর্মুলা ও ব্যাটার জানা নেই।

ওদেরই মতো নকল যানটা উইন্ডো গ্লাস দিয়ে এবার দেখতে পেলো পারিজাত। ঝলকমোহন বললেন, ব্যাটা ইউরোপার কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। আবার আসছে এদিকে।

ঝলকমোহন দু'তিনটে বোতাম টিপলেন। যান বক্রগতিতে ছুটতে লাগলো। আর একটা গোলা বেশ দূর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ঝলকমোহন।

কে ওই পাষণ্ড! আগে সেটা দেখতে হবে। —বলেই তিনি তাঁর যানকে এলোমেলো গতিতে চালিয়ে দ্বিতীয় ফেরিযানের মাথার ওপরে নিয়ে এসে লেজার রশ্মি ছুঁড়লেন ওটাতে। তিনি তাঁর স্পেকট্রাস্কোপের মুখও সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

লেজার রশ্মির সঙ্গে ফসফরাসের সমীকরণে তিনি এক ম্যাজিক আলো তৈরি করলেন, যা এক্স-রে থেকে কয়েক হাজার গুণ উন্নত। দ্বিতীয় মহাকাশযানের ভেতরটা তাতে দেখা যাবে তাঁর স্পেকট্রাস্কোপের মধ্যে দিয়ে। এবং দেখে তিনি চিৎকার করে, ঘুঁষি পাকিয়ে বললেন, ব্যাটা লুল্লুরাম! আমারই খেয়ে আমারই ঘাড় মটকাবার তালে আছো! তুমিই ঘরে বসে আমার ফর্মুলা ঝেড়ে ফাঁক করে দিয়েছো! তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

কিন্তু দেখা গেল, সেই যানটা দ্রুতগতিতে তাদের দিকে ছুটে আসছে। ঝলকমোহন কিছু বোঝা আগেই তাঁদের যানে সাঙ্ঘাতিক এক ধাক্কা লাগলো। তাঁদের যান গতি হারিয়ে সবেগে নেমে যাচ্ছে। ঝলকমোহন চট্টরাজ আর্ত

চিৎকার করে উঠলেন, ও-ব্যাটা আমাদের মহাকাশ অরবিটের খাদে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের কিচ্ছু করার নেই। আমরা খাদে পড়ে যাচ্ছি!

মুহূর্তের মধ্যে অরবিটে আছড়ে পড়লো ঝলকমোহনের ফেরীযান। তীব্র অভিঘাতে চিৎকার করে উঠলো পারিজাত। এতক্ষণ পরে এবার পারিজাত তার নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো।



ঘুম ভেঙে গেছে পারিজাতের। ঘুমোচ্ছিলো এবং কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছিলো সে। সে বিছানায় উঠে বসেছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, সকাল ন'টা। পারিজাত চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করলো কী স্বপ্ন সে এতক্ষণ দেখছিলো! তারপর মনে পড়লো, তাকে তো বিজ্ঞানী ঝলকমোহনের রিসার্চ সেন্টারে যেতে হবে। দেরি করা চলবে না! এতক্ষণ যা দেখেছে সব তো স্বপ্ন!

বেলা তিনটে নাগাদ পারিজাত ঝলকমোহন চট্টরাজের বাড়ি গিয়েছিলো। গিয়ে দেখলো বিজ্ঞানী বাড়িতে নেই। লুল্লুরাম বললো, তিনি শ্রীহরিকোটা গেছেন, রকেট সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তৃতা দিতে। ফিরবেন শুক্কুরবার। বলে গেছেন, সেদিন যেন পারিজাত অবশ্যই এখানে আসে। অনেক দরকারি কথা আছে নাকি।

পারিজাত লুল্লুরামকে দেখছিলো, আর ভাবছিলো তার দেখা স্বপ্নের কথা। কিন্তু সে লুল্লুরামের চোখমুখের অভিব্যক্তিতে আজ কোনো বিরক্তিভাব অথবা সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলো না।

মিস্টার তাকুফাকুর সিদ্ধান্ত

ঝলকমোহন চট্টরাজ তাঁর চারতলা বাড়ির ছাদে ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন বেলা তিনটে। চরাচর নিস্তব্ধ। বিজ্ঞানীর সর্বক্ষণের সঙ্গী কাম পরিচারক কাম অ্যাসিস্ট্যান্ট লুল্লুরাম দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর বেশ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। তবে লুল্লুরাম সর্বদাই টেনশনে থাকে। উন্মাদ বিজ্ঞানীর মতিগতির ঠিক নেই। কখন কোন্ বিষয় নিয়ে তুলকালাম করবেন তার কোনো ঠিক আছে নাকি! তাই তন্দ্রাঘোরেও লুল্লুরাম মাঝে মাঝে বলে ফেলে, কত্তামশাই বলেন, কী কত্তে হবে?

তখনই ক্র্যাং-ক্র্যাং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো। লুল্লুরাম তড়াক্ করে লাফ দিয়ে উঠলো। ছুটে গিয়ে ধরলো টেলিফোন।

হ্যালো!

হাঁল্লো মিস্টার ঝাল্কমোন! গুড মোরনিং! হাও আ ইও?

কথাবার্তা শুনে লুল্লুরামের চক্ষু চড়কগাছ। কী ভাষায় কথা বলছে রে বাবা! বিজ্ঞানী তাকে টেলিফোন বিষয়ে কয়েকটা ইংরিজি শিখিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে আছে ইয়েস, নট, হোল্ড অন প্লিজ, নো-নো, ভেরি গুড আর থ্যাঙ্ক ইউ। ফোনের উল্টোদিকের লোকটার কথা শুনে কোনো দিশে না পেয়ে সে বললো, ইয়েস ইয়েস। থ্যাঙ্ক ইউ। আই-আই বুলাতা হ্যায় ঝলকমোহনকে পিলিজ। হোল্ড অন। হ্যাঁ হ্যাঁ। হোল্ড অন।

নিচের ড্রইং রুম থেকে ওপরের ল্যাবরেটরিতে ইন্টারকমে কথা বলার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন বিজ্ঞানী। লুল্লুরাম ইন্টারকমের রিসিভার তুলে বাটন টেপামাত্রই ওপাশে ঝলকমোহনের গলা।

হ্যালো!

কত্তামশাই, ফোন।

কার ফোন?

জানিনে। কতা বুজতে পারতেছি না। বললো, গুড মোরনিং, হাঁও-মাও-খাঁও।

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! বুঝতে পেরেছি। একটু হোল্ড করতে বল। আমি

নামছি।—উদাত্ত হাসি হেসে ঝলকমোহন রিসিভার নামিয়ে রেখে ল্যাবরেটরি থেকে নিচে ছুটলেন। ড্রইংরুমে এসে ফোন ধরলেন।

হ্যালো, আমি ঝলকমোহন বলছি।

হাঁলো, ঝাল্‌কমোন, আমি তোকিও থেকে মিস্টার তাকুফাকু কথা বলছি।

ওহ্ মাই গড! মিস্টার তাকুফাকু! বলেন কী! আপনি টোকিওতে? কিন্তু—



হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছো। আমার এখন নাসায় থাকার কথা। আমি গতকালই নিউইয়র্ক হয়ে তোকিওতে এসেছি। তোমাকে জরুরী দরকার মিস্টার ঝাল্‌কমোন।

সে তো আমার সৌভাগ্য মিস্টার তাকুফাকু। বলুন, আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?

নাসাতে বসেই আমার হাতে কতগুলো বাজে রিপোর্ট এসেছে। ঘটনাগুলো পৃথিবীর টিঁকে থাকার ক্ষেত্রে মোটেই ভালো খবর নয়। তাই তোমার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

আমি কালই কলকাতা যাচ্ছি। বিষয়টা সিরিয়াস। তুমি মহাকাশযানের হার্বাল ইন্ধনের জন্য যে রিসার্চ চালাচ্ছিলে, তা কদ্দুর?

বলতে পারেন নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাজ হয়ে গেছে। এক চুলের জন্য আটকে আছে।

ফাইন! ঝাল্‌কমোন, তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। তোমার চিন্তার স্তর সম্পর্কে আমি দারুণ আশাবাদী। তুমি সাকসেস হবেই!

বিজ্ঞানী ঝলকমোহন হাসলেন। বললেন, তা হলে মিস্টার তাকুফাকু, আপনি কালকে কখন আসছেন?

আমি কাল রাত নটা নাগাদ দমদম এয়ারপোর্টে নামবো।

ঠিক আছে। আমি আপনাকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে যাবো। আপনি আমার বাড়িতেই থাকবেন।

ভেরি গুড! বাঙালি খানা বহুদিন চেখে দেখিনি। সেটা ফুলফিল হয়ে যাবে।

টেলিফোন নামিয়েই বিজ্ঞানী বাজখাঁই গলায় হাঁক দিলেন, লুল্লুরাম! আরে অ্যাই লুল্লুরাম! গেলি কোথায়?

ছুটে এলো লুল্লুরাম।—এই তো আমি, এখানেই আছি!

শোন, কালকে সকাল সকাল বাজারে যাবি। গলদা চিংড়ি আনবি। এঁচোড় আনবি। বড় দেখে মৌরলা মাছ পেলে নিয়ে নিবি। হয় পাবদা, না হলে বাচা মাছ নিবি। সবজি নিবি মোটামুটি বুঝেসুঝে। জম্পেশ রান্না করবি কালকে।

বুঝেছি। ওই হাঁও-মাও খাঁও আসছে।

ফের অট্টহাসি হেসে বিজ্ঞানী বললেন, মূর্খ আর কাকে বলে! উনি জাপানি পরিবেশবিদ। ওনার নাম মিস্টার তাকুফাকু ওকাউরু।

আমাদের গেরামেও তারুকাকু বলে একজন ছেলেন। তার ভালো নাম ছেল তারক মণ্ডল। ভালোই হলো। বলছি কি, রিফাইন তেল, মশলাপাতি আর কফি আনতে হবে।

কাল সব নিয়ে আসবি।

পরদিন ছিলো রবিবার। সারাদিনই ঝলকমোহন ছটফট করে কাটালেন।

হালে তিনি একটি মারুতি গাড়ি কিনেছেন। গাড়ি ড্রাইভ করেন নিজেই। একদম ফিটফাট হয়ে তিনি যখন গাড়ি নিয়ে তাঁর রহস্যময় বাড়ি থেকে বেরোলেন, তখন বাজে সন্ধে সাড়ে সাতটা। সোয়া আটটায় তিনি এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে পৌঁছে গেলেন। টোকিও থেকে কুয়ালালামপুর হয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি দমদমের মাটি ছুঁলো আটটা পঞ্চান্নয়।

প্লেন থেকে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে প্রথম দিকেই নামছিলেন মিস্টার তাকুফাকু। ঝলকমোহন দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। বিজ্ঞানী মনে মনে বললেন, তাকুফাকু দেখছি ঠিক আগের মতোই আছেন। তেমনি ছটফটে। চুলগুলো যা একটু সাদা হয়েছে।

নিজের ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিয়ে প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে লাউঞ্জে ঢুকে পড়লেন তাকুফাকু। ঝলকমোহনও ততক্ষণে তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন।

হাই ঝালক্‌মোন!

ইয়া তাকুফাকু!

দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগ আর বাঁধ মানে না। দীর্ঘ দশ বছর পরে দেখা।

দুই

গাড়িতে যেতে যেতে তাকুফাকু তাঁর কলকাতা ছুটে আসার কথা বিশদ বলছিলেন ঝলকমোহনকে।

বুঝলে ঝাল্‌কমোন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ-ব্যাপারে তুমি কিছু ভেবেছো?

না। আমি দূর গ্রহ বা উপগ্রহে টেরা ফর্মিং করার ব্যাপারে কাজ করছি।

ধুর-ধুর! পৃথিবীই যদি না বাঁচে, তোমার ওই টেরা ফর্মিং কী কাজে লাগবে?

কিন্তু হলোটা কী?

দেখো, ওজোন স্তরের ক্ষয়বৃদ্ধির জন্যে এমনিতেই পৃথিবী বিপদের মুখে। ওজোন স্তরের বাধা দেবার শক্তি কমে গেলে সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি-ই শুধু পৃথিবীতে আসবে তাই নয়, আরো বিপজ্জনক মারণরশ্মিও পৃথিবীতে ঢুকে মানব সমাজকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে।

কিন্তু ওজোন স্তরের ক্ষয় রুখতে তো বিশ্বব্যাপী পরিবেশবিদরা নানান কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। বসুন্ধরা বৈঠকও হলো ক'বছর আগে। যদিও

আমেরিকা এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসেনি।

কথা হচ্ছে, আমি কিন্তু ওজোন স্তরের ক্ষয় নিয়ে মোটেই চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম না। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার সম্পর্ক কী?

শোনো বলি। যে বিপদটা জ্বলন্ত হয়ে উঠছে, তা হলো, একদিকে পৃথিবীর মহাসাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা একটু একটু করে বাড়ছে, অন্যদিকে বেড়ে যাচ্ছে আমাদের বায়ুমণ্ডলের মুক্ত জলের পরিমাণ।

বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা এভাবে চলতে থাকলে মেরু প্রদেশের সঞ্চিত জমাট বরফে টান পড়বে।

রাইট, রাইট! তুমি যে শুধু মহাকাশের খবর রাখো, তাই নয় ঝাল্‌কমোন, তুমি আমাদের সুখদুঃখের পৃথিবীরও খবর রাখো। সাধে কি আর তোমাকে লাইক করি। ব্যাপারটা তুমি ঠিকই ধরেছো।

আমি জানতে চাইছি, আপনি কি টোটাল বিষয়টা নিয়ে চর্চা করছেন? এর ভবিষ্যৎ ফলাফল নিয়ে আপনি তো দেখছি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন!

বাস্তবিকই তাই। পরিস্থিতি গুরুতর। এ-ব্যাপারে আমি রিসার্চ পেপার প্লেস করতে যাচ্ছি। তাই নিয়ে আমি ফাইনালি তোমার সঙ্গে ডিটেইল আলোচনা করতে চাই।

ব্যাপারটা খুলে বলুন।

উত্তর মেরুর গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা?

এটুকু জানি, গ্রিনল্যান্ড আর তার আশপাশের সমুদ্র বরফেব জমাট চাদরে আচ্ছাদিত থাকে সবসময়।

সেই জমাট বরফই ভেঙে যাচ্ছে। গ্রিনল্যান্ডের বিরাট বিরাট হিমবাহগুলো দ্রুত ছুটছে। তার সঙ্গে ভেঙে যাওয়া বিশালাকার বরফের চাঁই সোজা চলে যাচ্ছে আটলান্টিকে। যদি বিগত ছ' সাত বছরের হিসেব করো, তাতে দেখা যাচ্ছে এইরকম বরফ নেমে আসার পরিমাণ প্রায় আড়াই গুণ বেড়ে গেছে।

তাতেই কি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে?

এগজ্যাগড্‌লি! হিমবাহ পথের হিমশৈল এবং বরফগলা জল যা গ্রিনল্যান্ড থেকে নামছে, তাতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার বছরে এক ইঞ্চির দশ ভগ্নাংশের এক ভাগের সতেরো শতাংশ।

ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়ছে বলেই হিমবাহ ছুটছে দ্রুত?

হ্যাঁ। এর জন্য ষোলো আনাই দায়ী মানুষ। মানুষের লোভ লোলসা এমন জায়গাতে পৌঁছেছে যে, তাদের আর পেছন ফিরে তাকাবার সময় নেই।

ঝলকমোহন গাড়ির গতি না কমিয়েই বেশ দক্ষতার সঙ্গে মারুতিকে বাইপাস থেকে বাঁ দিকের রাস্তায় ঘুরিয়ে দিলেন।



বাঃ বাঃ। এ-বয়সেও দেখছি গাড়িটা দারুণ চালাও হে ঝাল্কমোন!

আপনিই বা কম যান কিসে তাকুফাকু! প্লেন থেকে নেমে যেভাবে ছুটে আসছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, আপনার বয়স বুঝি বিশ বছর কমে গেছে।

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! নাউ আ অ্যাম সেভেনটি এইট। কিন্তু তুমিও তো কম যাও না! রিচার্ড পেক বলছিলো তোমার ছটফটানির কথা। আর মহাকাশযান তৈরির ব্যাপারে তুমি যে খেল দেখাবে, তা আমি বুঝতেই পেরেছিলাম।

গাড়ি ততক্ষণে ঝলকমোহন চট্টরাজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ছাদের ওপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ল্যাবরেটরিটি দেখা যাচ্ছিল, যা ফাইবারের চাদরে ঢাকা। তাই দেখে তাকুফাকু বললেন, তোমার ল্যাবরেটরি তো ওটাই?

হ্যাঁ।

তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরাও দেখছি তোমার ল্যাবরেটরির খুব প্রশংসা করেন।

লুল্লুরাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে লনে দাঁড়িয়েছিল। ঝলকমোহনকে বললো, এই আমাদের তারুকাকু?

আরে গবেট, উপগ্রহ কোথাকার! ইনি তারুকাকু নন, ইনি জাপানের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী তাকুফাকু ওকাউরু।

ওই তারুকাকুই ভালো। কাকুরু ফাকুরু বাদ দ্যান। এবার গিয়ে ফেরেশ হয়ে ন্যান। খেতে দেবো।

এক একটা করে পদ সাবাড় করছেন আর সোল্লাসে চিৎকার করে উঠছেন তাকুফাকু।

আহা, অপূর্ব! কি অসাধারণ রান্না! একেই বলে বাঙালি খানা। আমি মুগ্ধ! আজ রাতেই আমি গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্যার সমাধান করে ফেলবো।—খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন তাকুফাকু।

পোস্ত দিয়ে গলদা চিংড়ির ভাপা, মাখা মাখা করে মৌরলা মাছের ঝাল ছাড়াও ছাঁকা তেলে ভাজা মৌরলা মাছ। আলু দিয়ে বাচা মাছের হালকা ঝোল, নাড়কেল দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, কাঁচা আমের চাটনি আর গোপালভোগ চাল দিয়ে ঘন দুধের পায়েস। একেবারে চেটেপুটে খেলেন জাপানি বিজ্ঞানী।

দারুণ! তুলনা নেই ঝাল্‌কমোন! কে রান্না করলো এ-সব?

আমাদের লুল্লুরাম। লুল্লুরামকে ছাড়া আমার একটা দিনও চলে না। আমার এতবড় বাড়ি, ভেষজ উদ্যান, ফুলের বাগান, ল্যাবরেটরি সবকিছু দেখাশোনা করে লুল্লুরাম। ও না থাকলে আমি ঠুঁটো জগন্নাথ।

ওকে লাল্লুরামা, আমি তোমাকে টোকিও নিয়ে যাবো। সেখান থেকে নাসা। এমন রান্না খেলে সায়েন্টিস্টদের মস্তিক একেবারে সাফা হয়ে যাবে।

লুল্লুরাম মনে মনে বললো, এক পাগলকে নিয়েই সামলাতে পারি না। ফের আর এক পাগল। হুঁ!

ঘড়িতে এখন রাত এগোরোটা। খাওয়া দাওয়ার পরে তাকুফাকুর সঙ্গে আরেক দফা আলোচনাও হয়ে গেছে ঝলকমোহনের।

তাকুফাকু বলছিলেন, কানাডা ও ইউরোপের কিছু দেশের পাঠানো উপগ্রহের সাহায্য নিয়েছিলো নাসা। আমিও নিয়েছিলাম। তাতে গ্রিনল্যান্ডের হিমবাহবাহিত বরফের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া গেছে। উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল থেকে শুরু করে দু'হাজার পাঁচ পর্যন্ত বরফের চাঁই নেমে আসার আঙ্কিক হিসেব অবশ্যই আতঙ্কের ব্যাপার।

কীরকম?

আমরা, পরিবেশবিদ ও গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছি, উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে গ্রিনল্যান্ডে জমাট বরফের ক্ষতির পরিমাণ ছিলো ছিয়ানব্বই ঘন কিলোমিটার। দু'হাজার পাঁচ সালে তা দাঁড়ায় দুশো কুড়ি ঘন কিলোমিটারে। এক ঘন কিলোমিটার বরফ সমান কতটা জল তোমার জানা আছে ঝালক্‌মোন?

অঙ্ক করে বলতে হবে।

আমি বলছি, শোনো। এক ঘন কিলোমিটার বরফ সমান এক ট্রিলিয়ন লিটার জল। বলা যেতে পারে অন্ততপক্ষে তা ছাব্বিশ হাজার চারশো কোটি গ্যালন জল।

ওরে বাপ রে বাপ! তার সঙ্গে দুশো কুড়ি গুণ করলে বিরাট ফিগার হয়ে যাচ্ছে! সে তো বিপুল পরিমাণ জল!

হ্যাঁ, এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে মোটের ওপর বছরে তিন মিলিমিটার করে। এটা সত্যি, বিজ্ঞানীদের অনুমানের চেয়ে অনেক বেশিই ভাঙছে গ্রিনল্যান্ডের জমে থাকা বরফ।

আপনি বলছেন, এর সবটাই হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য?

আমি বলছি না। এটা ঘটনা। গবেষণা করেই এই তথ্য জানা গেছে।

আমরা পৃথিবীর এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎকে ঠেকাবো কী করে?

সে জন্যই তোমার কাছে ছুটে এলাম।

আমি এ ব্যাপারে কী করতে পারবো? আপনারাই এ-বিষয়ে পায়োনিয়ার।

পারবে, পারবে। আমার মাথায় তোমার গতিশক্তি গবেষণার ব্যাপারটা স্পার্ক করে গেছে এই ক'দিন আগে। তখন থেকেই সমানে ভেবে যাচ্ছি। নাসা থেকে টোকিও ছুটে এলাম। পরশু রাতেই সমাধান বিন্দুতে পৌঁছে গেছি।

তাকুফাকুর কথা শুনে বিজ্ঞানী হতবাক হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন। তাই দেখে হা-হা করে দিলখোলা হাসি হাসলেন তাকুফাকু ওকাউরু। তারপর বললেন, চলো, তোমার তথ্যকেন্দ্রে নিয়ে চলো।

ঘড়িতে এখন রাত বারোটা। ঝলকমোহনের বাড়িতেও অন্ধকার নেমে এসেছে। প্রথমে বাড়ির পেছনে বিঘে তিনেক জমিতে তিনি ভেষজ উদ্যান করেছিলেন। ফের সাত বিঘে জমি কিনেছেন। এখন দশ বিঘে জমির ওপর ভেষজ উদ্যান আরো বেড়েছে। এরই সঙ্গে তাঁর সাবেক গবেষণাগারটির কলেবর বাড়িয়ে সম্পূর্ণ তথ্যকেন্দ্রের রূপ দিয়েছেন। ঝলকমোহন তাকুফাকুকে নিয়ে মূল বাড়ির পেছনে চলে এলেন। সেখানে দেওয়ালের একটা সুইচে আঙুল রাখামাত্রই ভেষজ উদ্যানের সরু সরু আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলো হালকা আলোয় ভরে গেল।

সেই পথ ধরে চললেন ঝলকমোহন। পেছনে তাকুফাকু। বেশ খানিকটা গিয়ে বেশ বড়সড় একটা চৌকো বাক্সের মতো দেড়তলা বাড়ি। কোনো জানালা নেই তাতে। তবে ওপর দিকে চার দেওয়ালে দু'টো করে মোট আটটা ভেন্টিলেটর আছে।

ঝলকমোহন সেই চৌকো বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকুফাকু বললেন, বাঃ, তোমার তথ্যকেন্দ্রের ভোল পাল্টে ফেলেছো দেখছি! ঝলকমোহন বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এটা আরো সমৃদ্ধ করেছি।

দরজা খুলে গেল। দু'জনেই তথ্যকেন্দ্রের ভেতরে ঢুকলেন। দেওয়ালের সুইচে হাত রাখলেন ঝলকমোহন। ঘর আলোকিত হলো। একই সঙ্গে ভেষজ উদ্যানের আলো নিভে গেল। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটিও। স্টিলের সিঁড়ি বেয়ে দু'জন ওপরতলায় উঠে এলেন। গা ছমছমে নৈঃশব্দ্য এখানে।

তিন

একটা হলঘর। সামনের দেওয়াল ধবধবে সাদা পর্দার মতো। এপাশে গোটা দশেক চেয়ার পাতা। তার দু'টোয় দু'জন বসেছেন। ঝলকমোহনের সামনে একটা সুইচবোর্ড। তিনি টক্-টক্ করে গোটা পাঁচেক সুইচ টিপলেন। সামনের দেওয়ালে ফুটে উঠলো সৌরজগতের ছবি। সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো পাক খাচ্ছে। কোনো কোনো গ্রহের চারপাশে পাক খাচ্ছে উপগ্রহগুলো।

তুমি পৃথিবীর উত্তরমেরুতে চলে এসো।—বললেন তাকুফাকু।

ঝলকমোহন সুইচ টিপলেন। পর্দা জুড়ে এখন শুধুই পৃথিবী। বিজ্ঞানী বাটন পুশ করেই যাচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে পর্দা জুড়ে চলে এলো উত্তর মেরুমণ্ডল। দেখা গেল আমেরেশিয়া আধার, ইউরেশিয়া আধার, উত্তর মহাসাগর, বোফোর্ট সাগর, কানাডা আধার, লাপটেভ সাগর, নিউ সাইবেরীয় দ্বীপপুঞ্জ, পিটার প্যাট্রিক দ্বীপ, ফ্রানজ জোসেফ ভূমি, লিঙ্কন সাগর, এলেসমিয়ার, এলিজাবেথ দ্বীপপুঞ্জ, গ্রিনল্যান্ড ডেন।

এবার গ্রিনল্যান্ডের দিকটা খেয়াল করো ঝাল্‌কমোন।—বদ্ধ ঘরে তাকুফাকুর গলা গম্‌গম্ করে উঠলো। ঝলকমোহন তাকুফাকুর কথাগুলো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

গ্রিনল্যান্ডের দু'পাশটা দেখো। এপাশে বাফিন উপসাগর, হোম উপসাগর, ডেভিস প্রণালী হয়ে ল্যাব্রাডর সাগর ধরে বরফের চাঁইগুলো দ্রুতগতিতে আটলান্টিকে নেমে আসছে। ওদিকটায় শ্যানন দ্বীপ, গ্রিনল্যান্ড সাগর, নরওয়েজিয় সাগরের পাশ দিয়ে ডেনমার্ক প্রণালী ধরে আইসল্যান্ডকে পাশে রেখে বরফের চাঁই নামছে আটলান্টিকে।

হ্যাঁ, সেদিন একটা সায়েন্স জার্নালে পড়ছিলাম, গত কুড়ি বছরে গ্রিনল্যান্ডের তাপমাত্রা বেড়েছে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ঠিকই। সেই হিসেব ধরলে সমস্ত গ্রিনল্যান্ডের জমাট বাঁধা সব বরফ গলতে এক হাজার বছর লেগে যাবে। কিন্তু পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ, অপরিকল্পিত কলকারখানা তৈরি, ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের প্রয়োগ সাঙ্ঘাতিক ভাবেই বাড়ছে। এভাবে যদি বরফের আচ্ছাদনই গরম হয়ে যায়, ছুটে চলা হিমবাহের গতি আরো দ্রুত হবে।

সত্যি, মানুষের হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ লালসা সামলানোই যাচ্ছে না!

শোনো বলছি, পৃথিবীর মানুষ যদি নিজেদের শোধরাতে না পারে, আর এই রেশিওতে যদি পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়তেই থাকে, তবে গ্রিনল্যান্ডের জমা বরফ আরো দ্রুত ভাঙবে। সমস্ত বরফ ভেঙে যদি কোনো দিন সমুদ্রে চলে আসে, তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে এখনকার থেকে আরো একুশ ফুট। তাতে পৃথিবীর সেরা সেরা শহরও জলের নিচে চলে যাবে।

সর্বনাশ!

এবার আমি তোমার ল্যাবরেটরিতে যেতে চাই।

চলুন।

চার

বিজ্ঞানীর চারতলা বাড়ির ছাদে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ল্যাবরেটরি ফাইবারের চাদরে ঢাকা। রিমোট দিয়ে দরজা খুললেন ঝলকমোহন। দু'জনে ল্যাবরেটরিতে ঢোকামাত্রই দরজা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে গেলো। ঝলকমোহনের পেছন পেছন চললেন তাকুফাকু। যেখানে কাচের টেবিলে বিজ্ঞানীর ভেষজ ইন্ধনের কাচের জারগুলো সাজানো, সেখানে চলে এলেন তাঁরা। এখানটায় এসে ঝলকমোহন আলো জ্বাললেন। বেশ জোর আলো। কিন্তু স্নিগ্ধ।

ভারী কাচের টেবিলে সারি সারি সাজানো বহু বর্ণের তরল ভর্তি কাচের জারগুলো। তার ওপর আলো ঠিকরে পড়লো। সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে ছিটকে গেল স্বচ্ছ ফাইবারের দেওয়ালে। নানা রঙের খেলা শুরু হয়ে গেল ল্যাবরেটরি জুড়ে। তাই দেখে তাকুফাকু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে বললেন, ভেরি নাইস ঝাল্‌কমোন। তোমার এই আশ্চর্য বাড়িতে সবকিছুই অদ্ভুত সুন্দর!

দেখুন, পৃথিবী জোড়া এত বৈভব, কম্পিউটারের এত উন্নতি, তথ্যপ্রযুক্তির দানবীয় কার্যকলাপ, মারণাস্ত্রের দাপাদাপি বাদ দিয়েও সহজ সুন্দর জীবনযাপন করা যায়। আমি তাতেই বিশ্বাস করি। আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বাংলাকে ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি সবুজকে। তাই প্রাচীন ভেষজ গবেষণার হাত ধরে পৃথিবীজোড়া এই বিকৃত অত্যাধুনিকতা চর্চার সমান্তরালে শ্যামল-সুন্দরের চর্চা ও গবেষণা চালাচ্ছি আমি।

জানি, জানি ঝাল্‌কমোন। তুমি একদিন সফল হবেই। পৃথিবীর মানুষ যেদিন পবিত্র মন নিয়ে এই আকাশ বাতাস, সমুদ্র আর নদীজল, সবুজ মাঠ প্রান্তরের দিকে তাকাতে পারবে, সেদিনই তোমার চিন্তাকে এরা উপলব্ধি করতে পারবে।

দুই বিজ্ঞানীর কথায় আবেগ ঝরে পড়ছিলো। পৃথিবীর মানুষের ভালোর জন্যই তাঁরা কাজ করে চলেছেন, তারই নমুনা পাওয়া যাচ্ছিলো তাঁদের চিন্তা-ভাবনায়।

ঝলকমোহন চট্টরাজ এতক্ষণে তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, মিস্টার তাকুফাকু, আমি বলেছিলাম, ভেষজ ইন্ধনের সাহায্যে আমি সুতীব্র গতিশক্তি তৈরি করতে চাই। আমার মহাকাশযানে কোনো এমন জ্বালানি থাকবে না, যা উত্তাপ সৃষ্টি করে।

আরে বাবা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঠেকাতে সেই জন্যই তো আমি তোমার তত্ত্বটি

প্রয়োগ করতে চাই। তোমার ভেষজ ইন্ধনের শক্তি যাচাই করে দেখি।

কাচের টেবিলে সারি সারি সাজানো জারে বিভিন্ন রঙের তরল ভর্তি। লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি, কমলা, হলুদ। সব রঙগুলোই তীব্র। ঝলকমোহন সবুজ রঙের তরল ভর্তি কাচের জারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, এই সমস্ত তরলের মিশ্রণে যে জ্বালানি তরল তৈরি হবে, তা দিয়ে আমার মহাকাশযান ছুটবে আলোর গতির সমান গতিতে। আমি সমস্ত রঙের তরলের শক্তিকে কব্জা করে শান্ত করতে পেরেছি। শুধু সবুজ তরলটির মৌল উপাদানকে পৃথক করে তাকে সমাহিত করতে পারিনি। সে এখনও লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে। তাই আমার দু-মহাকাশ অভিযান চূড়ান্ত করতে দেরি হচ্ছে।

ঠিক আছে। তার আগে তুমি পৃথিবীর উত্তর মেরুমণ্ডলের অভিযান কমপ্লিট করো।

আপনার এই কথাটাই আমার কাছে ধোঁয়াশার মতো লাগছে। হিমবাহ বাহিত বরফের চাঁই যেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়াচ্ছে, সেখানে এই ভেষজ জ্বালানির সম্পর্ক কোথায়?

হাঃ-হাঃ করে প্রাণখোলা অট্টহাসি হাসলেন তাকুফাকু। বললেন, তার আগে আমি তোমার জ্বালানির শক্তি যাচাই করে নিতে চাই।

শুধুমাত্র সবুজ জ্বালানিই দেখানো সম্ভব। সে এখনও স্থিরসমাহিত হয়নি।

তাই দেখাও। তার আগে একটা কথা।

কী কথা?

তোমার ঘরে নিশ্চয়ই শক্তিশালী রেফ্রিজারেটর আছে?

তা আছে।

তাতে বরফ জমানো আছে?

আছে।

আমার মাঝারি সাইজের একটা আইস-শিট চাই।

হয়ে যাবে।

এবার তোমার সবুজ তরলের কেরামতি দেখবো।

ঝলকমোহন ল্যাবরেটরির অন্য প্রান্তে গিয়ে ক্লাম্প থেকে একটা কাচের টেস্ট টিউব খুলে নিয়ে এলেন। তার সঙ্গে একটা ড্রপার। তিনি সবুজ তরলের জারের কাচের ঢাকনাটি খুললেন।

ওমনি পরিস্থিতি বদলে গেল। তাকুফাকু শুনতে পেলেন অদ্ভুত এক শব্দ।

যেন বহুদূর থেকে ছুটে আসছে অনেকগুলো তেজী ঘোড়া। তারই শব্দ শোনা যাচ্ছে—টগ্‌বগ্‌-টগ্‌বগ্‌, টগ্‌বগ্‌-টগ্‌বগ্‌!

তাকুফাকু অবাক বিস্ময়ে দেখলেন জারের সবুজ তরল একটু একটু করে লাফাতে শুরু করেছে ফুটন্ত দুধের মতো।

এদিকে ঝলকমোহন জার থেকে ড্রপার দিয়ে মাত্র চার ফোঁটা সবুজ তরল টেস্ট টিউবে দিলেন। বন্ধ করে দিলেন জার। ওমনি জারের তরলের ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল। থেমে গেল টগ্‌বগ্‌-টগ্‌বগ্‌ শব্দ।

অবাক হওয়া বাকি ছিলো তাকুফাকু ওকাউরুর। দেখলেন, টেস্ট টিউবের চারফোঁটা সবুজ তরল এবার সাঙ্ঘাতিক লাফাতে শুরু করেছে। আর তেজী ঘোড়াদের ছুটবার শব্দ এখন খুব কাছেই। দারুণ গতিতে ছুটে চলেছে সেই ঘোড়াগুলো। শব্দ উঠছে টগ্‌বগ্‌-টগ্‌বগ্‌, টগ্‌বগ্‌-টগ্‌বগ্‌!

যদিও তাকুফাকু ঝলকমোহনের এই আবিষ্কারের কথা পুরোটাই জানতেন। এই নিয়ে বিভিন্ন সায়েন্স সেমিনারে তাঁর সঙ্গে ঝলকমোহনের কথাও হয়েছে। কিন্তু আজ ভেষজ শক্তি-তরলের নমুনা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন।

ঝলকমোহন টেস্ট টিউবটিকে ছিপি দিয়ে আটকে দিলেন। তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল তরলের লাফালাফি। একই সঙ্গে থেমে গেল টগ্‌বগ্‌ শব্দ। ঝলকমোহন বললেন, এই মুহূর্তে সবুজ তরলের গতির মাপ আলোর গতির অর্ধেক। এর মৌল উপাদানটি ভাঙতে পারলেই আমার মহাকাশ অভিযান এবং টেরা ফর্মিং পরিকল্পনা রূপায়িত হবে।

এ-জন্যই সবুজ তরলটি আমার চাই। ঝাল্‌কমোন, এতক্ষণ তোমার কথা শুনলাম। তোমার গবেষণা নিয়ে স্টাডি করছি বহুদিন ধরে। এবার গ্রিন এনার্জি নিয়ে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই।

কী করবেন?

তোমার এই টেস্ট টিউব নিয়ে এবার নিচে তোমার বাগানে চলো।

পাঁচ

রাত্রি এখন দু'টো কুড়ি। মিস্টার তাকুফাকু সবুজ তরলের টেস্ট টিউবটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঝলকমোহনের বাড়ির সামনের ফুলবাগানের ঘাসের লনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটা কাপড় জড়িয়ে একখণ্ড বরফ নিয়ে ঝলকমোহন লনে চলে এলেন। বাঁ হাতে তাঁর একটি স্টিলের জালতির মতো জিনিস।

তাকুফাকু জালতি আর বরফখণ্ডটি নিয়ে টেস্ট টিউব ঝলকমোহনের হাতে দিলেন। জালতির ওপর বরফখণ্ডটি বসিয়ে দুই হাতে শক্ত করে জালতিটি ধরে রাখলেন।



তাই দেখে ঝলকমোহনের মস্তিষ্ক দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলো। তিনি বুঝতে পারলেন তাকুফাকু কী চাইছেন।

টেস্ট টিউবটিকে তিনি দারুণ জোরে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিলেন। সেটিকে নিয়ে এলেন জালতিতে রাখা বরফের নিচে। টেস্ট টিউবের মুখের ছিপি খুলে

দিলেন। নিমেষে লাফিয়ে উঠলো সেই সামান্য সবুজ তরল। শুরু হয়ে গেল তীব্র শব্দের ধাক্কা।—টগ্‌বগ্-টগ্‌বগ্, টগ্‌বগ্-টগ্‌বগ্! টগ্‌বগ্-টগ্‌বগ্!

পরমুহূর্তেই লাফ দিয়ে উঠলো একটা নীল আগুনের শিখা। টিউব থেকে বেরিয়ে সেই আগুন কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লো। থেমে গেছে ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ। নীল আগুনের শিখাটি এবার আরো একটু লাফ দিয়ে বরফখণ্ডটির নিচে এসে থমকে দাঁড়ালো। কাঁটায় কাঁটায় দশ সেকেন্ড।

এবং তার পরেই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আগুন শিখাটি বরফখণ্ডটিকে পেঁচিয়ে নিয়ে উড়ে গেল ঊর্ধ্বাকাশে। এক লহমার ব্যাপার। লোহার জালতিটি তাকুফাকুর হাত থেকে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে সবুজ ঘাসের লনে। দু'জনের দৃষ্টি ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে ঊর্ধ্বমুখি দৌড়োতে থাকা সেই আগুন শিখার দিকে। মিনিট খানেক সেটি তাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ছিলো। তারপর আর দেখা গেল না। মহাকাশে বিলীন হয়ে গেল।

ঝলকমোহন ধীরে ধীরে বললেন, আলোর গতির অর্ধেক তো! বহুদূর চলে গেছে। আর দেখা যাবে না।

বাক্‌রুদ্ধ তাকুফাকু ওকাউরু। এবং হঠাৎই তিনি চিৎকার করে উঠলেন—হুরর-রে! আমি পেয়ে গেছি। যা চেয়েছিলাম, তাই পেয়ে গেছি!

কী পেয়ে গেছেন মিস্টার তাকুফাকু?

উত্তর মেরুর গ্রিনল্যান্ডে ভেঙে যাওয়া বরফের চাঁইগুলোকে আমি এই গতিশক্তির সাহায্যেই তাদের পুরনো জায়গায় ফেরত পাঠাবো।

ঝলকমোহন শান্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, তা হতে পারে। আপনার আইডিয়া নেহাৎ খারাপ নয়।

তাকুফাকু বললেন, তবে! তোমার সমান সমানই বুদ্ধি ধবি আমি, কী বলো?

অবশ্যই। এ-ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

এইসব কথা বলতে বলতে দু'জনে হাঃ-হাঃ করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

মঙ্গলে পৌঁছোলেন ঝলকমোহন

ঝলকমোহন চট্টরাজের মেজাজ খারাপ। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জল খেয়ে ওই যে স্টাডিরুমে ঢুকেছেন, আর বেরোননি। লুল্লুরাম একটু আগে



এক গ্লাস গরম কফি আর দুটো ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট নিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকেছিল।

লুল্লুরামকে দেখেই বিজ্ঞানী লাল চোখে কটমট করে তাকালেন। তাই দেখে

লুল্লুরামের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড়। তবু সে আমতা আমতা করে বলল, কত্তামশাই, আপনার ক্-কফি আর ব্-বিস্কুট!

আমি কি তোকে কফি-বিস্কুট আনতে বলেছি?—খিঁচিয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী।

না, মানে সকাল থেকে তো কি-কিছু খাননি, তাই—

বেরিয়ে যা! এক্ষুনি বেরো! আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ! হুঁ! আমাকে খাওয়াতে এসেছেন! ভারি আমার উপকারি বন্ধু রে!

বিজ্ঞানীর মেজাজ যেভাবে উর্ধ্বপানে উঠে চক্কর খাচ্ছে, লুল্লুরামের সাধ্য নেই তাকে বাগে আনার। আর ভরসা পেল না লুল্লুরাম। সে স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে সোজা কিচেনে চলে গেল।

কত্তামশাইয়ের মাথায় ফের কী ভূত চাপল কে জানে! সারাদিন এখন এমনি চলবে। চান-খাওয়ার বারোটা বাজল। বরং একবার পারিজাতদাকে ফোন করি। —এই ভেবে লুল্লুরাম ড্রইংরুমে এসে টপাটপ টেলিফোনের বাটন টিপে রিসিভার কানে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। টেলিফোনের ও-প্রান্তে পারিজাতেরই গলা—হ্যালো, বলুন।

হ্যালো, দাদা! আমি লুল্লুরাম বলছি!

আরে বলো, বলো। খবর কী? হঠাৎ এত সকালে ফোন! স্যার তলব করছেন নাকি?

না না! তা'লে তো ভালোই হত। কত্তামশাইয়ের মাথা বিগড়েছে ফের। আমি কোনো তাল পাচ্ছি না। আমার টেনশন হচ্ছে।

টেলিফোনে লুল্লুরামের গলায় উত্তেজনার আঁচ পেয়ে পারিজাত বলল, টেনশন কোরো না। এ তো রোজকার ব্যাপার। চলছে চলবে।

বলেন কি দাদা! ইস্টাডি রুমে ঢুকলেই আমায় তাড়া কচ্ছেন। টেনশন হবে না? যা আজ ওনার মতিগতি, সারাদিন খাবেই না।

এক মুহূর্ত থেমে পরিজাত ঠাণ্ডা মাথায় বলল, ঠিক আছে। চিন্তা কোরো না। রান্নাবান্নার জোগাড় যন্ত্র করো। আমি খানিক বাদে যাচ্ছি।

টেলিফোন ছেড়ে লুল্লুরাম মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। নিজে নিজেই বলল, চিন্তা কোরো না বললেই হলো! মানুষটাকে তো আমি চিনি। আমার হাড়মাস ভাজা ভাজা করে দিচ্ছে! আজ কপালে আমার দুর্ভোগ আছেই। যাক গে! রান্নাঘরে যাই।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিজ্ঞানী ঝলকমোহন চট্টরাজের চারতলা সাদা রঙের রহস্যময় বাড়িটিতে চলে এল পারিজাত সেন। গ্রামের মানুষের কাছে এই

বাড়িটি রহস্যময় মনে হলেও পারিজাতের কাছে আর এ বাড়ি রহস্যময় নয়। এখানেই বিজ্ঞানী তাঁর ল্যাবরেটরিতে ভেষজ জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন নীরবে। যুবক পারিজাত সেন ঝলকমোহনের গবেষণা কাজের একমাত্র সহকারী। পারিজাতই এই আপনভোলা প্রবীণ বিজ্ঞানীকে সবচেয়ে ভালো বোঝে। লুল্লুরামকে ছাড়া যেমন বিজ্ঞানীর জীবন চলে না, তেমনি পারিজাতকে ছাড়া তাঁর গবেষণা কাজ চলে না।

পারিজাতকে দেখে লুল্লুরাম যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পারিজাত বলল, কী হয়েছে?



আপনি নিজেই ইস্টাডি রুমে গিয়ে দেখে আসেন গে!

তড়িঘড়ি করে পারিজাত বিজ্ঞানীর স্টাডিরুমের দিকে ছুটল।

দরজা ভেজানো। কিন্তু ছিটকিনি খোলা। আস্তে করে দরজা ঠেলল পারিজাত। ভেতরে তাকিয়েই চমকে উঠল সে। দরজার মুখোমুখি টেবিলের সামনে বসে আছেন। সরাসরি তাঁকে দেখলো পারিজাত। চুলগুলো খামচে খামচে উশকোখুশকো করে ফেলেছেন তিনি। চোখ দুটো টকটকে লাল। টেবিলে ছড়ানো ছেটানো একগুচ্ছ বই আর সায়েন্স জার্নাল। মাথাটা একটু

নিচু করেই বসেছিলেন তিনি। দরজা খোলায় এক চিলতে আলো পড়েছে টেবিলে। তাতেই ঝটকা মেরে টানটান হয়ে বসলেন তিনি। চোখাচোখি হল পারিজাতের সঙ্গে।

পারিজাতকে দেখে বিজ্ঞানীর চোখের চাউনি একটু যেন নরম হলো। সেটা বুঝে পারিজাত ধীর পায়ে স্টাডিরুমে ঢুকে টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে বিজ্ঞানীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। পারিজাত মনে মনে ভেবেই নিল, খুব সাবধানে এগোতে হবে। একবার ফাউল করলে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যাবে।

পারিজাত বিজ্ঞানীর পেছনে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। স্টাডিরুম নিস্তব্ধ। এখনই হয়তো ঝড় শুরু হবে। অথবা নিপাট শান্তিও আসতে পারে। পারিজাত চুপ। বিজ্ঞানীও চুপ। প্রায় একশো সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। দুজনেই বোধ হয় চাইছে কেউ কথা বলুক। আরো কিছু মুহূর্ত পার হলো। পারিজাত মনে মনে ধীরস্থিরভাবে এগোচ্ছিল। আরো খানিক সময় পেরলো। এবার পারিজাত কথা বললো।

স্যার, এক এক সময় এমন হয়, কোনো কোনো বিষয়ের জট কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। তাই না?

ঝলকমোহন চুপ।

কয়েক মুহূর্ত থেমে পারিজাত ফের বললো, প্রবলেম সল্‌ভ না হলে কিছু আর ভালো লাগে না।

এবার বিজ্ঞানী ঝলকমোহনের ধীর-গম্ভীর প্রজ্ঞা-পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—পারিজাত!

বলুন স্যার।

মঙ্গলগ্রহে নতুন করে টেরা ফর্মিং করার আইডিয়া এসেছে।

আইডিয়াটা ঠিকই আছে। কেননা, আপনি বলেছিলেন, মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুতে যে কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড আছে, তাকে গলাতে পারলে ওখানে জলের জোগানটা অন্তত পাওয়া যাবে।

এগজ্যাগ্‌ডলি! যুবক, তুমি আমার চিন্তাটা ঠিক ধরতে পেরেছো।—উৎফুল্ল বিজ্ঞানী।

পারিজাত মনে মনে বলল, বাপ রে বাপ! ফাউল হয়নি। বাঁচা গেছে। মুখে বলল, আচ্ছা স্যার, আপনি যে বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপাতে টেরা ফর্মিংয়ের প্ল্যান করেছিলেন সে ব্যাপারে কী হল?

বিজ্ঞানীর চোখমুখ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে চুলগুলো উশকোখুশকো।

পারিজাত বুঝতেই পারল, এই নূতন ভাবনা বিজ্ঞানীর মাথায় গিজগিজ করছে। ভাবনাটা না বলতে পারলেই তাঁর মাথা গরম। লুল্লুরামের গরম কফি কি আর তাকে ঠাণ্ডা করতে পারে!

ঝলকমোহন কিছু একটা ভাবছিলেন। তাঁর মনে এই মুহূর্তে একের পর এক ভাবনার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। তিনি কথা বলার একজন সঙ্গী চাইছেন। যাতে ভাবনাগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যায়।

হ্যাঁ পারিজাত। তুমি তো জানোই, টেরা ফর্মিং অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহকে পৃথিবী সদৃশ করে গড়ে তোলার জন্য আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। ইউরোপাব মধ্যে তেমনি কিছু সুবিধেও ছিল। কিন্তু আমার ভেষজ জ্বালানি গবেষণা একটু থমকে যাওয়ায় সৌর জগতে অত দূরবর্তী অংশে গিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করতে আমি ভরসা পাচ্ছি না।

অবশ্য মঙ্গল সম্পর্কে প্রচুর তথ্য এখন পৃথিবীর মানুষ জেনে গেছে। শুধু তাই নয়। পৃথিবীকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সমস্যা থেকে মুক্ত করতেই আমি মঙ্গলে টেরা ফর্মিংয়ের কাজটা করতে চাইছি।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন স্যার! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বলছি। তুমি সামনের চেয়ারটায় বোসো।

স্যার, বলছি কি, এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কি খালি পেটে করা ঠিক হবে? আপনিই তো বলেন—

লুল্লুরাম কোথায়? কি করছে ও কিচেনে বসে? হতভাগা অলসের ডিপো একেবারে!—চিৎকার করে উঠলেন বিজ্ঞানী।

না স্যার। ও একেবারেই অলস নয়। আমি এক্ষুনি ওকে বলে আসছি। এক মিনিট।

পারিজাত ছুটে কিচেনে গেল। দেখল লুল্লুরাম মেঝেতে বসে সবজি কাটছে। পারিজাতকে দেখে সে লাফ দিয়ে উঠল। কি দাদা, কত্তামশাই কি কচ্ছে?

লুল্লুরাম, তুমি এক্ষুনি কফি বানাও। ঘরে মুড়ি চানাচুর আছে?

আছে।

তা হলে মুড়ির সঙ্গে চানাচুর মেখে পেঁয়াজ কুচিয়ে দাও। তার মধ্যে সরষের তেল দিয়ে দিও। গরম কফি আর মুড়ি মাখা। ঝটপট করো। কুইক! কুইক!

বলেই পারিজাত ছুটল স্টাডিরুমে। ঘরে ঢুকেই বসে পড়ল চেয়ারে।

দেখলো ঝলকমোহনের মুখমণ্ডল প্রসন্ন। তিনি কথা শুরু করলেন।

তুমি তো জানোই, যুদ্ধে ভয়ংকর মারণাস্ত্র প্রয়োগ, অপরিকল্পিতভাবে কলকারাখানা তৈরি ইত্যাদি কারণে পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে। উত্তর মেরুর গ্রিনল্যাণ্ডে জমাট বরফের চাঁই ফেটে বেরিয়ে এসে আটলান্টিকে মিশছে। মহাসাগরগুলোর জলস্তর বাড়ছে।

এ নিয়ে তো জাপানি পরিবেশবিজ্ঞানী মিস্টার তাকুফাকু ওকাউরুর সঙ্গে আপনার কথাও হয়েছে।

হ্যাঁ। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য উত্তর গোলার্ধ যতটা উত্তপ্ত হয়েছে, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, পোলাণ্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যাণ্ড, স্লোভেনিয়া, স্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশে তাপমাত্রা বেড়েছে তার তিন গুণ। যাঁরা জার্মানিতে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে গিয়েছিল, সবাই বলছে, বেশ গরম সেখানে।

কিন্তু এর সঙ্গে মঙ্গলগ্রহে টেরা ফর্মিংয়ের সম্পর্ক কী?

সবুর সবুর। জল যদি জীবনের প্রতীক হয়, জলীয় বাষ্পকে আজ তুমি পৃথিবীর মরণের কারণ বলতে পারো।

কেন? কেন?

বাষ্পীভূত জলকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। মিথেন, সালফার হেক্সক্লোরাইড, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড এগুলোও গ্রিন হাউস গ্যাস, যা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেই চলেছে। কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য বেশি পরিমাণে দায়ী জলীয় বাষ্প। প্রমাণ পাওয়া গেছে, জলীয় বাষ্প ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে তা বায়ুমণ্ডলে বিকিরণ করে। ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

স্যার, একটা ব্যাপার কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে, জলবায়ু বা ঋতুচক্রের প্যাটার্নের বেশ পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই তো খুব কম সময় শীত থাকে। গরমই তো বছরের বেশি সময় জুড়ে। দু'হাজার ছয়ের জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে লন্ডন শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একদিন চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠেছিল। ভাবাই যায় না!

সূর্যরশ্মি, মেঘস্তর এ-সব কিন্তু তার জন্য দায়ী নয়।

তবে?

সুইজারল্যাণ্ডের ওয়ার্লড রেডিয়েশন সেন্টারের গবেষক রল্‌ফ ফিলিপোনা বলেছেন, ক্রমবর্ধমান গ্রিন হাউস গ্যাসই এর কারণ। তার মধ্যে এক নম্বর অপরাধী হচ্ছে জলীয় বাষ্প। অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো রোজ বায়ুমণ্ডলে জমা হচ্ছে গাড়ির একজস্ট, ফ্রিজ, কলকারখানার চিমনি ইত্যাদি থেকে। তাই

আমি ভাবছি, মঙ্গলগ্রহতেই পরিবেশ দূষণ ঘটাবো। তবে যদি পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়।

বিজ্ঞানীর এসব কথায় এবার পারিজাতের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড়। এবং সত্যিই সে এ-সব কথার পরিষ্কার অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না। মঙ্গলগ্রহে দূষণ ঘটিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করা! এ-আবার কেমন কথা রে বাবা!

হো-হো করে অট্টহাসি হেসে ঝলকমোহন বললেন, বুঝেছি, মগজে কিছু ঢুকছে না। দাঁড়াও যুবক, সব ক্লিয়ার করে দিচ্ছি।

তক্ষুণি স্টাডিরুমের দরজা খুলে গেল। বড় ট্রে-তে চায়ের পট আর কাচের



বাটিতে মুড়িমাখা নিয়ে ঢুকল লুল্লুরাম।

একটু আগে যে কত্তামশাইয়ের মেজাজ তেতে টগবগ করে ফুটছিল, এখন তাঁকে অট্টহাসি হাসতে দেখে লুল্লুরাম অবাক। মনে মনে বললো, আচ্ছা ভেলকি দেখাচ্ছেন বটে! পাগল নিজে, আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বেন।

পট থেকে কাপে কফি ঢেলে দেওয়ামাত্রই গরম কফির গন্ধে ভরে গেল স্টাডিরুম। কারুকার্য করা দুটো কাচের বাটিতে মুড়িমাখা। তাই দেখে বিজ্ঞানী বেজায় খুশি। লুল্লুরাম বললো, চানাচুর, পেঁয়াজ কুচি আর নারকেলের টুকরো দিয়ে মুড়ি মেখে সরষের তেল নেড়ে দিয়েছি। খেয়ে নিন। দেখুন, কেমন হয়েছে।

ফাইন! লুল্লু, তোর জবাব নেই! বিজ্ঞানী সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কফিতে চুমুক।

লুল্লুরাম অভিমানী কণ্ঠে পারিজাতকে কানে কানে বললো, আমার নাকি জবাব নেই! খানিক আগেই আমাকে দূর দূর করে তাড়াচ্ছিলেন।

তাই খেয়াল করে বিজ্ঞানী খেপচুরিয়াস হয়ে বললেন, কি, আমার নামে লাগানো-ভাঙানো হচ্ছে?

পারিজাত আশঙ্কিত। সে মনে মনে বললো, এই রে! এক্ষুনি স্যারের মেজাজ সপ্তমে উঠে যাবে। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না স্যার। ও বলছিল, মুড়িমাখাটা খেয়ে দেখুন। কি টেস্টি হয়েছে!

তবু ভালো। তবে আমাকে নিন্দেমন্দ করার একটা স্বভাব ওর আছে। ও একটা পাজি উপগ্রহ, ধূমকেতুর পুচ্ছ!

আপনি মুড়িটা মুখে দিন। চমৎকার মেখেছে!

ঝলকমোহন কাচের বাটি থেকে এক মুঠো মাখা মুড়ি নিয়ে মুখে পুরলেন। ফের আরেক মুঠো। তাঁর মুখমণ্ডল অনাবিল খুশিতে ভরে গেল।

তিনি গর্বিত ভঙ্গিতে পারিজাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লুল্লুরাম আমার আবিষ্কার। বুঝলে যুবক। রান্নাবান্না, খাবারদাবারের ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট। ব্যাটাচ্ছেলে মাধ্যমিকটা দিয়ে আর কিছুতেই পড়ল না। পড়াশোনা করলে দাঁড়িয়ে যেত।

আপনার বাড়ি, স্টাডিরুম, ভেষজ উদ্যান, ল্যাবরেটরি, কিচেন সব সামলাচ্ছে। যোগ্য ম্যানেজার। এও তো বিশাল কাজ। বিশ্বখ্যাত মহাকাশবিজ্ঞানীর ম্যানেজার। চাট্টিখানি ব্যাপার!

হো-হো করে অট্টহাসি হেসে বিজ্ঞানী বললেন, চলো এবার। আমি আমার আসল কথায় ফিরে যাই।

কোথায় যাব?

আমার তথ্যকেন্দ্রে।

দুই

ঝলকমোহন চট্টরাজের এই চারতলা বাড়িটি ও ভেষজ উদ্যান এখন দশ বিঘে জমির ওপর। তাঁর ভেষজ উদ্যানে রয়েছে কালমেঘ, গাঁদাল, হরিদ্রা, থানকুনি, অশ্বগন্ধা, শিউলি, নিম, পুদিনা, অর্জুন, বহেড়া, হরিতকি, নয়নতারা, আমলকি, তুলসী, পদ্মগুলঞ্চ, ডালিম এমন অনেক গাছ। ভেষজ উদ্যানের মধ্যেকার সরু রাস্তা দিয়ে পারিজাতকে নিয়ে বিজ্ঞানী তাঁর তথ্যকেন্দ্রে চলে এলেন।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই তথ্যকেন্দ্রের চারপাশ অ্যাসবেস্টাসের বেড়া দেওয়া। তার ভেতরে বেশ লম্বা দুটো পাকা ঘর। দরজার লক খুলে পারিজাতকে নিয়ে বিজ্ঞানী ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। ঘরের চতুর্দিকে অ্যালুমিনিয়ামের র‍্যাকগুলো বই আর ফাইলে ঠাসা। তাই তো এই ঘর তাঁর তথ্যকেন্দ্র। বিশেষভাবে তৈরি ঘর দুটো। বিজ্ঞানী পারিজাতের ডান হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন, এদিকে এসো।

দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে তিনি দেওয়ালের একটা বিশেষ জায়গায় হাত দেওয়া মাত্র সাদা আলোয় ঘর ভরে গেল। ঘরটা দেখে পারিজাত বলল, ঘরটা বদলে ফেলেছেন দেখছি! বিজ্ঞানী বললেন, হ্যাঁ, যতটা সম্ভব আধুনিক করা যায়। নাও, ওই চেয়ারটায় বোসো।

পারিজাত চেয়ারে বসামাত্র ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের দরজাটাও একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। গমগম শব্দে ঝলকমোহনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—পারিজাত, সামনের দিকে তাকাও!

এর আগেও এই ঘরে কৃত্রিম মহাকাশ দেখেছে পারিজাত। কিন্তু এবার দেখলো আরো নিখুঁত, স্পষ্ট ও বিস্তারিত। শোনা গেল ঝলকমোহনের কণ্ঠস্বর—অনেকদিন বাদে এখানে এলে পারিজাত। আমি এখানে কম্পিউটারের মাধ্যমেই পর্দাতে মহাকাশ, সৌরজগৎ কিংবা নক্ষত্রজগৎকে নিয়ে আসছি। আরো ডিটেলে দেখতে পাবে এখন।

ঝলকমোহনের হাতের রিমোট কাজ শুরু করতেই পর্দায় মহাকাশের ছবি পালটে যেতে লাগল। এখন পর্দা জুড়ে শুধু সূর্য। ঝলকমোহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ফের—

পারিজাত, সূর্যের চারদিকে আটটা গ্রহ আর প্লুটো ও অন্য বামনগ্রহরা বোঁ বোঁ করে ঘুরেই চলেছে। ক'টা গ্রহ আর ক'টা বামন গ্রহ বা গ্রহাণু ঘুরছে, মহাকাশবিজ্ঞানীরা তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি।

কিন্তু স্যার, মঙ্গলে টেরা ফর্মিং করবেন কী করে? বললেন, পৃথিবীকে বাঁচাতে মঙ্গলের পরিবেশ দূষণ ঘটাতে হবে, সেটাই বা কী জিনিস?

এসব কথার উত্তর দিলেন না বিজ্ঞানী। তাঁর ডান হাতের আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে রিমোটের বাটনে। ফের ঝলকমোহনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—

এই দ্যাখো, লালগ্রহ মঙ্গল। মঙ্গল নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের নানা স্বপ্ন, নানা কল্পনা, পরিকল্পনা, নানা অনুমান। আমি কোনো অনুমান-নির্ভর কথা বলছি না। দ্যাখো, খেয়াল কর।

পারিজাত সমস্ত পর্দা জুড়ে দেখতে পেল মঙ্গলগ্রহকে। এবার পর্দায় মঙ্গলের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল চলে এসেছে।

লক্ষ কর পারিজাত, দেখা যাচ্ছে কঠিন পাথরের স্তূপ যেন। আসলে এগুলি কঠিন থেকে কঠিনতর বরফ। কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এখানেই আমি পরিবেশ দূষণ ঘটাতে চাই।

কেমন করে?

তার আগে তোমাকে আরো কয়েকটি ব্যাপার বোঝাতে চাই। নাসা থেকে দুটো রোবোযান স্পিরিট ও অপারচুনিটিকে মঙ্গলে পাঠানো হয়েছিল। রোবোযান দুটো মঙ্গলের পার্বত্য ও মরুভূমি এলাকায় নামে। খননকার্য চালায়। অপারচুনিটি নেমেছিল মেরিডিয়ানি প্ল্যানামে। সে নাসার জেট প্রপালসান ল্যাবরেটরিকে খবর দেয়, ওই অঞ্চলটা একসময় লবনজল ভরা সাগর ছিল। মঙ্গলের এই জায়গাটাকে কেমন লাগছে পারিজাত?

সমতল ভূমির মতো।

এবার কী দেখছ?

কী বলব! দেখে একটা স্টেডিয়ামের মতো লাগছে।

তা ঠিকই। এটাকে এনডিওরেন্স আগ্নেয়গিরি বলা হচ্ছে। স্পিরিট রোবোযান বলছে, এনডিওরেন্স আগ্নেয়গিরি আগে হয়েছে। তারপর মেরিডিয়ানি প্ল্যানাম। অপারচুনিটি রোবোযান এনডিওরেন্স আগ্নেয়গিরির লাগোয়া টিলাগুলো ধৈর্যের সঙ্গে বারবার দেখছে। একেবারে নির্দিষ্ট নকশার ফাটল খুঁজে পেয়েছে এই রোবোযান। পৃথিবীতে যেসব আগ্নেয়শিলা পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে এখানকার পাথরের ফাটলের চেহারার পুরোপুরি মিল দেখেছে রোবোযানের ইনফ্রারেড ক্যামেরা।

কিন্তু স্যার, মঙ্গলকে আপনি যদি পৃথিবীসদৃশ করতে চান, তার জন্য জল

চাই, অক্সিজেন চাই। চাই মিথেনও।

হ্যাঁ। এই জাতীয় প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। এ-ব্যাপারে নাসার ভূতত্ত্ববিদ ডক্টর জন গ্রোটাজিনজারের মতামতটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি কী বলেছেন?

তিনি বলেছেন মঙ্গলের টিলার পাথরগুলো একসময় স্বাভাবিক জলেই ভেজা ছিল। কিন্তু মঙ্গলগ্রহের যে তাপমাত্রা, তাতে সেই জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। এই ত্বরিৎগতি বাষ্পীভবনের ফলে হঠাৎ টিলার পাথরে অমন সুন্দর ফাটল দেখা দিয়েছে।

রোবোযান স্পিরিট কি ইনফরমেশন পাঠিয়েছিল?

স্পিরিট মঙ্গলগ্রহের যেখানটায় নেমেছিল, বিজ্ঞানীরা সে জায়গাটাকে বলছেন গৌসেভ ক্রাটার। স্পিরিটও এখানে সামান্য জলের খোঁজ পায়।

সবাই জলের খোঁজ পাচ্ছে। অনুমান করছে জল ছিল। কিন্তু সেই জল কোথায় গেল?

দেখ পারিজাত, মঙ্গল সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের নানারকম স্টান্টবাজি আছে, সেটা আমারও মনে হয়েছে। কেননা আমি ইউরোপা নিয়ে তোমার সঙ্গে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন তোমাকে জোরের সঙ্গেই বলেছিলাম, মঙ্গলে প্রাণ নেই। কোনোমতেই থাকতে পারে না!

আপনার সেই মত থেকে কি আপনি এখন সরে আসছেন?

একটুও না। কিন্তু আমি কোনো স্টান্টবাজিতে বিশ্বাসী নই। আমি নিজের চোখে সবকিছু যাচাই করে নিতে চাই। মঙ্গলে কোনোকালে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কি ছিল না, এ ব্যাপারে আমি আগ বাড়িয়ে একটি কথাও বলব না। আনতাবৃড়ি হুটহাট যারা অমন কথা বলে দেয়, তারা মিডিয়ার প্রচারের আলোয় নিজের নামটা তুলে ধরতেই বেশি আগ্রহী। বিজ্ঞানের সত্যকে খুঁজে বের করার দিকে কতটা আগ্রহ আছে ওইসব হিপোপটেমাসদের, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।

পারিজাত বুঝল, বিজ্ঞানী বেলাইনে চলে যাচ্ছেন। তাই তাড়াতাড়ি করে বলল, স্যার, মঙ্গলে জল আদৌ ছিল কি?

এ-কথাটা শুনে বিজ্ঞানী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। সামনের পর্দার পুরোটা জুড়ে লাল গ্রহ মঙ্গলকে দেখা যাচ্ছিল। তাঁর হাতের রিমোট ফের সক্রিয় হয়ে উঠল। পর্দায় মঙ্গলের একটা বিশেষ অঞ্চল ক্লোজ আপে দেখা গেল।

পারিজাত, এই জায়গাটাই গৌসেভ ক্রাটার। খুব ভালো করে লক্ষ করে দ্যাখো, মনে হবে যেন, একদিন এখানে জল ছিল। রোবোযান স্পিরিটের ইনফ্রারেড ক্যামেরার চোখে জায়গাটা এভাবেই এসেছে। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরে খুব সাবধানে আমি আমার মতামত জানাচ্ছি। রুখাশুখা মঙ্গলগ্রহে জলের উপস্থিতি থাকলেও তা ছিল খুব কম সময়কাল। এই জলের দুটো উৎস আমি অনুমান করে নিচ্ছি। এক, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে থাকা বাষ্পকণা। দুই, মঙ্গলের মাটির নিচে জমে থাকা বরফ।

এবার আপনি টেরা ফর্মিংয়ে আসুন। কেনই বা মঙ্গলে দূষণ চাইছেন, তা বলুন।

তুমি মঙ্গলে যেতে চাও?

আচমকা ঝলকমোহনের এমন কথায় পারিজাত হতচকিত হয়ে গেল। তারপর একটু মজা করেই বলল, আপনি যদি নিয়ে যান, অবশ্যই যাব।

তৈরি থেকো তা হলে। এখানে আর নয়। এখানকার কাজ শেষ।

এই বলে তিনি সুইচ টিপে আলো জ্বালানোমাত্রই সাদা দেওয়ালের ঘরটি একেবারে ঝকঝক করে উঠলো। কম্পিউটারও বন্ধ করে দিলেন তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, চলো।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল দু'জন। সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের দরজা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে গেল।

চলো এবার। মঙ্গলে যাবার ব্যবস্থাপনা পাকা করে ফেলেছি। ভেষজ জ্বালানি দিয়ে স্পেস শাটল চালানোর ব্যাপারটা এখনও আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই আছে।

কোথায় যাব?

তোমাকে তো এর আগে আমি আমার স্পেস শাটলের প্রাইমারি মডেলটা দেখিয়েছিলাম। এখন তাকে আমি আরও উন্নত ও জটিলতামুক্ত করেছি। চলো, সেটা দেখবে চলো।

বিজ্ঞানী প্রায় দৌড়োচ্ছেন। পারিজাত ছুটল তাঁর পিছু পিছু। এঁকেবেঁকে গেছে শান বাঁধানো রাস্তা। ওরা চলে এল তথ্যকেন্দ্রের পেছন দিকে। পারিজাত অবাক। এসব তো আগে ছিল না! এখানে কংক্রিট বাঁধানো বিরাট এক চত্বর করা হয়েছে। যে মূল লম্বা প্যাটার্নের বাড়ির মধ্যে বিজ্ঞানীর তথ্যকেন্দ্র ও প্রোজেক্টর রুম, সেই বাড়ির পেছন দিকেই রয়েছে ঘোরানো সিঁড়ি। উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত। শান বাঁধানো চত্বর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে। ঝলকমোহন

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠতে শুরু করেছেন। পারিজাতকে বললেন, কুইক্! কুইক্! এসো শিগগির।

কে বলবে মানুষটার বয়েস আটাত্তর বছর! পারিজাত ভাবছিল তাই। কেমন তরতর করে তিনি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। সত্যি, অসাধারণ তাঁর কর্মক্ষমতা! মনটাও শিশুর মতো পবিত্র।

মূল বাড়ির কাঠামো থেকে ছাদটি চারদিকে অনেক বেশি চওড়া। বাড়তি করে শক্তিশালী কংক্রিট ঢালাই করা হয়েছে। ছাদের ঠিক মাঝখানে ফাইবার শেডের নিচে ঝলকমোহনের তৈরি মহাকাশযানটি যেন চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এর আগে একবারই বিজ্ঞানী তাকে মহাকাশযানের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এই দ্বিতীয়বার পারিজাত ঝলকমোহনের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি মহাকাশযানটির সামনে দাঁড়িয়ে। সে দেখল বিজ্ঞানীর চোখে খুশির ঝিলিক। এবার কথার তুবড়ি ছোটালেন তিনি।

পারিজাত, আর কারোকে তোয়াক্কা করি না আমি! আমার স্পেস শাটল্ এখন যে কোনো মুহূর্তে উড়বার জন্য তৈরি। যে ভেষজ জ্বালানি আমি তৈরি করেছি, তার সাহায্যে আমার যান আলোর গতির অর্ধেক গতিসম্পন্ন হবে। আমি প্রথমে মঙ্গলেই যেতে চাই। দেখব, ওখানে টেরা ফর্মিং করা যায় কি না। তারপরই আমার ফরমুলার প্রয়োগ।

কী ফরমুলা?

ওই যে বললাম, মঙ্গলের পরিবেশকে ভয়ংকর দূষণে ভরিয়ে দেওয়া।

ফের ভ্যাবাচ্যাকা খেল পারিজাত। আবার সেই কথা! ব্যাপারটা খোলসা করে বলছেনও না তিনি। পারিজাতের অমন অপ্রতিভ চেহারা দেখে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন বিজ্ঞানী।

অপেক্ষা করো যুবক। সব প্রশ্নের জবাব তুমি পাবে। এর আগে আমার স্পেস শাটলের নতুন মডেলটা তোমাকে ডিটেলে বুঝিয়ে দিই।

লম্বাটে, মাথার দিকটা ধানের গোলার মতো, মহাকাশযানটি বিরাট ফাইবারের ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। ঝলকমোহন তাঁর জামার পকেট থেকে রিমোট বের করলেন। বাটনে আঙুল ছোঁয়ালেন। ওমনি অদ্ভুত এক শব্দ উঠল। যানের ফাইবারের ঢাকনাটি মাঝ বরাবর ভাগ হয়ে দু পাশে সরে গেল। যেন ওটা জীবন্ত কোনো কিছু।

পারিজাতকে এর আগেও তাঁর তৈরি মহাকাশযান দেখিয়েছিলেন

ঝলকমোহন। তবে সেটি ছিল একেবারে বাংলার কৃষকবাড়ির ধানের গোলার মতো। এই যানের মাথার দিকটা তেমনই আছে। তবে মূল শরীরের পরিবর্তন হয়েছে। শরীর আরও লম্বাটে। কী ধাতু দিয়ে তৈরি তা বুঝতে পারছে না পারিজাত।

এবার বিজ্ঞানী সিরিয়াস। মাপা শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলছেন এখন।

শোনো পারিজাত, নানা ভুল ভ্রান্তি পেরিয়ে আমি সম্ভবত এতদিনে একটি নিখুঁত স্পেস ক্যাপসুল তৈরি করেছি। আমাদের দেশ ধনী নয়। ধনী দেশগুলো বিজ্ঞান গবেষণা বা মহাকাশ জয় করতে গবেষণাক্ষেত্রে যত টাকা খরচ করে, আমাদের সরকার তার দশ ভাগের এক ভাগও দিতে পারবে না। তখন থেকেই আমার মাথায় এসেছিল ভারতীয় ভেষজ গবেষণার উন্নতরূপ দেবার ব্যাপারটা। তুমি তো জানোই, ভেষজ জ্বালানি গবেষণাক্ষেত্রে আমি সফল। এই জ্বালানি ব্যবহার করে মহাকাশযানকে আলোর গতির অর্ধেক গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

আপনি বলছিলেন, আপনার যানকে অনেকটা জটিলতামুক্ত করেছেন?

হ্যাঁ। এক নম্বর, কোনো রকেটের মাধ্যমে এই যানকে মহাকাশে পাঠাতে হবে না। সরাসরি সে নিজে ছুটবে। দুই, তীব্র গতিসম্পন্ন করতে হার্বাল ব্যাটারি নিরাপদে কাজ করবে। তিন, বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণের সঙ্গে ভেষজ শক্তি মিশিয়ে যানের বডি তৈরি করা হয়েছে, যা মহাজাগতিক সমস্ত তাপ ও চাপ সইতে পারবে। চার, এটি চালানোর পদ্ধতি খুব সহজ। যে কোনো মোটর বাইকের হ্যাণ্ডেলের মতো। চাপ ও তাপ নিরোধক গ্লাস দিয়ে ছুটন্ত যান থেকে বাইরের সব কিছু দেখা যাবে। যানের মাথায় ও নিচের দিকে মোট চারটি স্বয়ংক্রিয় মুভি ক্যামেরা থাকছে, যা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। মহাকাশযানের মধ্যে এবং মঙ্গলে নেমে ওখানে সবকিছু দেখার সময় যে স্পেসস্যুট পরব, তাও আমার নিজের উদ্ভাবিত। তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সংরক্ষিত আছে। সূর্যের আলো গ্রহণ, সংরক্ষণ ও পরিশোধন করে আমার স্পেস শাটলের বাইরের এবং ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করেছি খুব সহজ পদ্ধতিতে।

মঙ্গলে টেরা ফর্মিং করবেন কী পদ্ধতিতে? আপনি বলছেন, মঙ্গলে পরিবেশ দূষণ ঘটাবেন! কিন্তু কেন?

ফের হো-হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন মহাকাশবিজ্ঞানী ঝলকমোহন

চট্টরাজ। বললেন, বাদবাকি বিষয়টা কালকে বলব। মঙ্গলে যাবার জন্য তৈরি থেকো। ভেষজ জ্বালানির শক্তিভরা এই যান পাঁচ ঘন্টায় মঙ্গলে যাবে। ফিরে আসবে পাঁচ ঘন্টায়। দু'ঘণ্টা আমরা মঙ্গলের মাটিতে পর্যবেক্ষণ চালাব। মোট বারো ঘণ্টা। বুঝলে ছোকরা! হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ !

তিন

সেদিন রাতে প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। তার সঙ্গে গুরু-গুরু মেঘের গর্জন। পারিজাত শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছিল বিদ্যুতের ঝিলিকে বাইরেটা বারবার আলোকিত হয়ে উঠছে। একসময় ঘুমিয়েও পড়ল সে। ঘুমের মধ্যেও সে বৃষ্টি আর বাজ পড়ার শব্দ টের পাচ্ছিল। একসময় গভীর ঘুমে ডুবে গেল পারিজাত। নিশ্চিদ্র ঘুম তাকে চেতনা থেকে বহুদূর কোনো এক জগতে নিয়ে গেল, যেখানে সমস্তই নিঃসীম শূন্যতায় ছেয়ে আছে।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল ঘড়ির কাঁটা ধরে। রাত এগোচ্ছে। সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর রাতে তুমুল বৃষ্টি তাপমাত্রা বেশ কমিয়ে দিয়েছে। ঘুমের মধ্যেও পারিজাতের খুব ঠাণ্ডা লাগছিল। এদিকে ফ্যানও চলছে পুরো স্পিডে।

শেষ রাতে পারিজাতের ঘুম বুঝি হালকা হয়ে এল। তার মনে পড়ে গেল, তাই তো, আজ তার স্যারের সঙ্গে মঙ্গল অভিযানের প্ল্যান রয়েছে। ও তড়াক করে উঠে পড়ল। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে তার। ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখল অদ্ভুত আলোয় ভরে আছে চারদিক। মাঝ আকাশে হালকা মেঘ ঘোরাঘুরি করছে। তাই বুঝি চরাচর জুড়ে এমন অদ্ভুত আলো। ভাবল পারিজাত।

তার মাথায় এল, ঝলকমোহন বলেছিলেন, মোট বারো ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মঙ্গল অভিযান কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্যারের বাড়িতে পৌঁছনো দরকার।

পারিজাত একটুও সময় নষ্ট করল না। হাত মুখ ধুয়ে জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

বিজ্ঞানীর বাড়িতে পৌঁছে সে দেখল, তিনি অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন। তাই দেখে পারিজাত জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে স্যার?

আরে, তুমি এত দেরি করলে? ওই যে লুল্লু কফি তৈরি করে রেখেছে।

ভোরে উঠে নিজেই সিঙাড়া বানিয়েছে। চট করে খেয়ে নাও। আজ পৃথিবীতে খাওয়া এটুকুই। পৃথিবীতে সূর্য ওঠার আগে আমরা রওনা দেব। ফিরব এখানে সূর্য ডোবার আগে অথবা সেই মুহূর্তে। আমি আমার অভিযানের রুটিনে এক ঘণ্টা এক্সট্রা টাইম ধরে রাখলাম।

লুল্লুরাম বড় প্লেটে করে কফি আর সিঙাড়া নিয়ে বারান্দায় টেবিলের ওপরে রাখল। বিজ্ঞানীর কথার শেষ অংশটুকু শুনে বলল, হাওড়া ইস্টিশনে ট্রেন আসার মতো দেখছি আপনার মহাকাশযানের টাইম।

মানে?

ওই যে ইস্টিশনে মাইকে বলে, অমুক ট্রেন এক ঘণ্টা পরে ইস্টিশনে এসে পৌঁছবে। সেইরকমই বুঝি আপনার মহাকাশযানের টাইম!

নে নে, বেশি ডেঁপোমি করতে হবে না। ব্যাটা বদখত উপগ্রহ কোথাকার!

লুল্লুরাম বিজ্ঞানীকে খোঁচা দিয়ে আর দাঁড়াল না। কেটে পড়ল মানে মানে।

কফি সিঙাড়া খেয়েই ঝলকমোহন তাড়া লাগালেন। পারিজাত, তুমি জলদি চলে এসো। আমি তথ্যকেন্দ্রের ছাতে গিয়ে স্পেস শাটল রেডি করছি। বলেই ঝলকমোহন দৌড়লেন। হঠাৎই তিনি যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পারিজাতের কাছে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিকই ঠেকল।

খালি কাপ-প্লেট নামিয়ে রেখে পারিজাতও ছুটল। তথ্যকেন্দ্রের পেছনে গিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে পারিজাত অবাক। দেখল স্পেস শাটল একেবারে রেডি। সেটার দরজা খোলা। যানটি একেবারে ঝকঝক করছে। না সোনালি না রূপোলি, ম্যাটফিনিশ সেটার রঙ। যানের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিজ্ঞানী তাকে ডাকলেন, পারিজাত এসো। কুইক্! কুইক! —বিজ্ঞানীর পরনে অদ্ভুত স্পেসস্যুট।

যানের দরজার বাইরের হ্যান্ডেল দুটো ধরে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল পারিজাত। ওমনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশ। যেন ভিন্ন গ্রহ এটা। স্পেটস্যুট পরা ঝলকমোহনের গলাও অন্যরকম লাগছে। তিনি বললেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও! স্পেসস্যুট পরিয়ে দিচ্ছি।

স্পেসস্যুটটা মানুষের আদলে তৈরি দুভাগে ভাগ করা। সোজা দাঁড়িয়ে থাকা পারিজাতের সামনে-পিছনে সেটা লাগিয়ে দেওয়ামাত্র চুম্বকের মতো তা তার শরীরে সেঁটে গেল। বিজ্ঞানী তাঁর স্পেসস্যুটের পকেট থেকে দু'টো উজ্জ্বল নীল রঙের বড়ি বের করে নিজে একটা মুখে পুরলেন। পারিজাতকে একটা দিয়ে বললেন, মুখে পুরে নাও। আগামী ষোলো ঘণ্টার খাদ্য। খিদে

তেষ্টা আর কিছু পাবে না।

আর দেরি নয়। আমরা এক্ষুনি রওনা দেব।

এ-কথা বলেই হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ঝলকমোহন যানের ওপর দিকে উঠে গেলেন। ওখানে চালকের আসনে বসে সিটবেল্ট আটকে নিলেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, স্টার্ট!



সামান্য একটু ঝাঁকুনি। পারিজাত বুঝতে পারছিল, তার শরীরটাও হালকা লাগছে। বিজ্ঞানী যানের ওপর থেকে চেঁচালেন, পারিজাত এখানে এসো!—পারিজাতও একই ভাবে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে স্টিয়ারিং রুমে উঠে গেল। এখানে চারপাশে স্বচ্ছ অদ্ভুত ধাতুর গ্লাস। তাই দিয়ে বাইরের সব দিকটা দেখা যাচ্ছে। এবার বেশ জোর ঝাঁকুনি। চিৎকার করে উঠলেন

পৃথিবীর অভিকর্ষ বলয় থেকে মুক্ত হয়ে সৌরজগতের মধ্যে দিয়ে ছুটছি

আমরা। এখনো অবধি আমার ভেষজ জ্বালানি পারফেক্ট কাজ করছে। যানের গতি আলোর গতির অর্ধেক। এক্কেবারে কারেক্ট অঙ্ক। বাইরেটা দেখ পারিজাত। চাঁদের উজ্জ্বল অংশ পুরো পাঁচ মিনিট দেখতে পাবে। চাঁদের যেদিকে এখন সূর্যের আলো পড়েছে, আমরা সেই পাশ দিয়েই যাচ্ছি!

উইন্ডো গ্লাস দিয়ে সীমাহীন মহাকাশের বুকে বিশাল চাঁদকে দেখছিল পারিজাত। কি দারুণ দেখতে! স্নিগ্ধ রূপ। পৃথিবীতে পূর্ণিমার রাতে যে গোল চাঁদকে দেখা যায়, এখান থেকে তার দশগুণ বড় লাগছে। যেন হাত দিয়েই ধরা যাবে। চাঁদের বুকে দাগগুলো আরো স্পষ্ট।

হঠাৎই উধাও হয়ে গেল চাঁদ। ঝপ করে রাত নামল। ঝলকমোহন বললেন, এবার আমরা চাঁদের উলটোদিকে, অর্থাৎ রাতের পার্টে চলে এসেছি।

অন্ধকারে উইন্ডো গ্লাস দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে পারিজাত দেখতে পেলো আকাশ ভর্তি তারা। স্থির আলোর দুটো গ্রহও দেখতে পেল। পারিজাত জিজ্ঞেস করল, ও দুটো কী?

একটা পৃথিবী। আর একটা শুক্র।

পৃথিবী থেকে এত দূরে চলে এলাম?

হ্যাঁ। এবার চাঁদের অভিকর্ষ ক্রস করব।

ফের একটা ঝাঁকুনি। বিজ্ঞানী বললেন, চাঁদের রাত্রি পেরিয়ে এক্ষুনি সরাসরি আমরা সূর্যের আলো পেয়ে যাবো।

সত্যিই, মুহূর্তের মধ্যে ভোর, সকালের আলো, তার একটু পরেই মধ্য দুপুর এসে গেল। বিজ্ঞানী বললেন, আমাদের ছোট্ট ট্যুর। মাঝে আর কোনো ঝামেলা নেই। এবার সোজা মঙ্গল। মনে হচ্ছে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। ব্যস, কেল্লা ফতে!

চার

এতক্ষণ ধরে একটা সূক্ষ্ম শব্দ হচ্ছিল, পারিজাতের সেটা মাথায় ছিল না। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেই শব্দটা থেমে গেল, তখন সেটা তার মালুম হল। ঝলকমোহন দারুণ জোরে চেঁচিয়ে বললেন, এসে গেছি মঙ্গলগ্রহে। আমাদের যানের গতি স্তব্ধ।

তিনি সিট বেল্ট খুলে ফেলেছেন। ভেসে ভেসে চালকের আসন থেকে নেমে স্পেস শাটলের দরজা খুলে ফেললেন। খুলেই লাফ দিয়ে একেবারে বাইরে।

যানের দরজা খোলামাত্রই কনকনে হিমঠাণ্ডা অনুভব করল পারিজাত। উইন্ডো গ্লাস দিয়ে দেখল, বিজ্ঞানী তাকে ইশারায় ডাকছেন। পারিজাত একই ভাবে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

আজ সকালে পৃথিবীতে নিজের বাড়িতে ঘুম থেকে উঠে যে অদ্ভুত আলো দেখেছিল পারিজাত, মঙ্গলের এই জায়গাটাতে পাবিজাত তেমনই স্নিগ্ধ আধো অন্ধকার অবস্থা দেখতে পেল। স্পেস স্যুটের ভেতর দিয়েও কনকনে ঠাণ্ডা



লাগছে তার। পারিজাত দেখল উৎসাহ আর উদ্দীপনার ঠেলায় বিজ্ঞানী লাফালাফি শুরু করে দিয়েছেন। একটু লাফ দিলেই চল্লিশ পঞ্চাশ হাত ওপরে উঠে যাচ্ছেন। ভেসে ভেসে নেমে আসতে আট থেকে দশ মিনিট সময় লেগে যাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীর হুঁশ আছে। এবার ভেসে ভেসে পারিজাতের কাছে এসে বললেন, হাতে মাত্র দু'ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে কাজ সেরে নিতে হবে।

আমরা এখন কী করব?

শোনো, আমরা মঙ্গলের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এসে নেমেছি।

এখানেই তো কার্বন-ডাই-অক্সাইড কঠিন হয়ে আছে?

হ্যাঁ। শোনো, নাসার অ্যামিস রিসার্চ সেন্টারের ওয়েন টুন, জেমস কাস্টিং ও ক্রিস্টোফার ম্যাককে একটা ফরমুলা হাজির করেছিল। সেটাকেই একটু ডেভলপ করে আমি মঙ্গলে টেরা ফর্মিং করার জন্য প্রয়োগ করতে চাই।

ফরমুলাটা কী?

মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুর এই কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে গলিয়ে বাষ্পীভূত করতে হবে। এই বরফ গললে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আস্তরণ মঙ্গলের আবহমণ্ডলকে ঘিরে ফেলবে।

কিন্তু কী করে করবেন সে কাজ?

এখানে দূষণ ছড়িয়ে দেব।

মানে?

কলকারখানা আর গাড়ির ধোঁয়া থেকে বেরোনো যে গ্রিন হাউস গ্যাস পৃথিবীতে দূষণ ছড়াচ্ছে, সেই গ্রিন হাউস গ্যাস এখানে উৎপাদন করার ব্যবস্থা করব। ডজনখানেক কারখানা বানাতে হবে এখানে, যারা অটোমেটিক গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি করবে। এখানকার বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দেবে। এর জন্য যত মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন জ্বালানি দরকার, সূর্যের আলো থেকেই সে তাপমাত্রা তৈরি করে নেওয়া যাবে।

তাতে কী হবে?

প্রত্যেক বছরে কমপক্ষে এক লক্ষ মেট্রিক টনের মতো গ্রিন হাউস গ্যাসের দূষণ মঙ্গলে ছড়িয়ে দিতে হবে। তা হলে আশা করছি বছর বিশেকের মধ্যে তাপমাত্রা বেড়ে যা দাঁড়াবে, তাতে এখানকার কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গলে বাষ্পীভূত করার পক্ষে যথেষ্ট।—একটু দম নিয়ে বিজ্ঞানী ফের শুরু করলেন, এ-রকম পরিস্থিতি তৈরি করা গেলে এখানে শ্যাওলা আর ছত্রাক জন্মাতে শুরু করবে। মঙ্গলে নিজস্বভাবে প্রাণের দেখা পাব আমরা।

সেই আবহাওয়াতে কি মানুষ এখানে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারবে?

এখনও ততটা ভাবিনি। তবে উদ্ভিদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠার ফলে প্রথম পর্বে সবুজ হয়ে উঠবে এই লাল গ্রহ। তখন দূষণ তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ করে দেব।

কিন্তু মানুষই যদি—

আরে দাঁড়াও! কথাটা শেষ করি। যা বুঝতে পারছি, তাতে মানুষজন শুধু অক্সিজেন মুখোশ পরে মঙ্গলে চলে ফিরে বেড়াতে পারবে। কেন না পৃথিবীর অনেক উঁচু পাহাড়ে এমনই তাপ এবং বাতাসের চাপ থাকে।

আজ আপনি এখানে কি করতে চান?

মঙ্গলের কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে যাব পৃথিবীতে।

এবার বিজ্ঞানী তাঁর স্পেসস্যুটের পকেট থেকে একটা সোনালি রঙের হাতুড়ির মতো জিনিস বের করলেন। তার একটা দিক অবশ্য ধারালো কুঠারের



মতো। তিনি বললেন, আমার এই হাতুড়ি কাম কুড়ুল যেমন ধারালো, তেমনই শক্তিশালী। মঙ্গলের পরিবেশকে মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে মিশ্রিত ধাতু দিয়ে।

বলেই তিনি উবু হয়ে বসে সেই কঠিন মাটিতে খনকটি দিয়ে তেরচাভাবে

দু'তিন বার আঘাত করলেন। উঠে এল একখণ্ড কঠিন শিলা। সেটি হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন বিজ্ঞানী। পারিজাতকে বললেন, বুঝতে পারছ, আমরা কী করতে চাইছি?

জলের মতো পরিষ্কার।

বলো, কি করতে চাই আমি?

এই শিলাখণ্ড নিয়ে আপনি আপনার ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করবেন। কতটা দূষণ, অর্থাৎ কতটা গ্রিন হাউস গ্যাস প্রয়োগ করলে এটি বাষ্পীভূত হয় তা দেখবেন।

সাব্বাস যুবক! তা হলে মঙ্গলে পরিবেশ দূষণ করার ফরমুলা তোমার কাছে ক্লিয়ার?

এক্কেবারে পরিষ্কার!

চলো তা হলে। উঠে পড়ি আমাদের স্পেস ক্যাপসুলে।

বলেই মহাকাশবিজ্ঞানী ঝলকমোহন চট্টরাজ এক লাফ মারলেন। সাঁ করে উঠে গেলেন প্রায় একশো হাত ওপরে।

এবারে তিনি শূন্যে সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চললেন তাঁর স্পেস শাটলের দিকে। বিজ্ঞানীর ছেলেমানুষি উন্মাদনা দেখে সত্যিই বারে বারে অবাক হয়ে যায় পারিজাত। কি অসাধারণ তাঁর প্রাণশক্তি। সে দেখছিল, স্পেসস্যুট পরিহিত বৃদ্ধ মানুষটির হাতে বেশ বড় একখণ্ড মঙ্গল-শিলা। সেটা নিয়ে তিনি ভাসতে ভাসতে তাঁর মহাকাশযানের দিকে এগোচ্ছেন। শূন্য থেকেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন, পারিজাত, আর একটুও দেরি নয়। ঝটপট ঢুকে পড়ো স্পেস শাটলে। টাইম মেনটেইন না করতে পারলে ভেষজ জ্বালানি শর্ট পড়ে যাবে। তাহলেই কেলো। চিরজীবন মহাকাশের মহাশূন্যে উজবুকের মতো পাক খেতে হবে।

স্পেসস্যুট পরে থাকলে কী হবে, পারিজাতের শীত শীত ভাবটা কিন্তু যায়নি। ঝলকমোহন স্পেসশিপের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। এবারে ঢুকে পড়ল পারিজাতও। যানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞানী স্টিয়ারিং বক্সে পৌঁছে গেছেন। আবার এক ঝাঁকুনি। সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-শোঁ শব্দ। যানের ভেতর ঝলকমোহনের কণ্ঠস্বর গম্‌গম্‌ করে উঠল।

পারিজাত, এবার আমরা আমাদের পৃথিবীর দিকে! তুমি আমার পাশে চলে এসো।

পারিজাত যানের দেওয়ালে হাতের ভর রেখে ভেসে ভেসে যানের মাথার

দিকে চলে গেল। ওখানে সিটে বসে সিটবেল্ট বেঁধে নিয়ে উইন্ডো গ্লাস দিয়ে দেখতে লাগল সৌরজগতের অপরূপ দৃশ্য। ঝলকমোহনের মন খুশিতে ভরে আছে। কখনো শিস দিচ্ছেন। কী করবেন, দিশে পাচ্ছেন না। ফের তিনি কথার ফোয়ারা ছোটালেন।

পারিজাত!

বলুন?

কঠিন অবস্থায় থাকলেও মঙ্গলে রয়েছে অফুরন্ত জলের ভাণ্ডার। যে-সব মৌলিক উপাদান প্রাণের সহায়ক, সেগুলোও ওখানে আছে। যেমন অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি। এছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড তো রয়েছেই। দূষণ ছড়িয়ে তাপ যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত হবে। এভাবে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া যায়, তা হলেই গ্রিন হাউসের কাজকর্ম বেড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই হাতে-গরম রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বুঝলে ছোকরা!

হাতে-গরম রেজাল্টটা কী?

খুব সহজ ব্যাপার। এর ফলে মঙ্গলের আবহমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়বে। এই যে ওখানে এখন কনকনে হিমশীতল অবস্থা দেখে এলে, তা থাকবে না। যখন এ-রকম পরিস্থিতি আসবে, তখন মঙ্গলে টেরা ফর্মিং অর্থাৎ পৃথিবীসদৃশ করা আর কঠিন কাজ হবে না।

ব্যাপারটা সত্যিই এখন পারিজাতের কাছে জলবৎ তরলং মনে হল। বিজ্ঞানীর খুশিতে সেও খুশি হয়ে উঠল।

ঝলকমোহনের মহাকাশযান আলোর অর্ধেক গতিতে ছুটে চলেছে। যানের শোঁ- শোঁ যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল সে। ঝলকমোহন বললেন, বাঁ দিকে তাকাও। শনিকে দেখতে পাবে।

বাঁ দিকে তাকানোমাত্র খুব স্পষ্ট শনিগ্রহকে দেখতে পেল পারিজাত। তার চারদিকে কি সুন্দর বলয়। যেন তীব্রতর বেগে তা ঘুরে চলেছে। পারিজাত শুক্রগ্রহও দেখতে পেল। পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল লাগছে। তবে খুব ছোট। ঝলকমোহন বললেন, এখন রাত কেন বলতে পার?

কেন?

আমাদের মহাকাশযান আর সূর্যের মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছে পৃথিবী। সূর্যের আলো আর পাচ্ছি না আমরা। আমরা পৃথিবীর দিকে এখন সোজাসুজি চলেছি। পৃথিবী ক্রমশ বড় হয়ে সূর্যকে আড়াল করে দিচ্ছে। মনে

হচ্ছে এদিকেও আমাদের আধ ঘণ্টা সেফ হবে। সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তথ্যকেন্দ্রের মাথায় ল্যান্ডিং গ্রাউণ্ডে নামব। দ্যাখো না, কেমন হইহই শুরু হয়ে যায় পৃথিবীতে।

তা হলে লুল্লুরামের টিপ্পনিটা আর খাটল না।

আগে বাড়ি পৌঁছোই। তারপর ব্যাটাকে আচ্ছা করে দেব। আমরা স্পেস শাট্‌ল নিয়ে মাজাকি করা!

পৃথিবীর অভিকর্ষের মধ্যে ঢুকছি আমরা। গতি নিয়ন্ত্রণ করছি। পারিজাত, জোর ঝাঁকুনি হবে। শক্ত করে ধরে রেখো।

পারিজাত সাবধান হল। এতক্ষণ মহাকাশযানের দুরন্ত গতি টের পাওয়া যাচ্ছিল না। ঝলকমোহন ধাপে ধাপে যানের গতি কমাচ্ছিলেন। বারবার ঝাঁকুনি হচ্ছিল। যানের গতি অনেক কমে এসেছে। পাশাপাশি সে যানের যান্ত্রিক শোঁ-শোঁ আওয়াজ আরো বেশি মাত্রায় শুনতে পাচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। এখনও বেশ শীত করছে। ঘুম পাচ্ছে পারিজাতের।

মহাকাশযানের গতি এবার সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে আনলেন ঝলকমোহন।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। ঘুম ভেঙে গেলো পারিজাতের। বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে।

ধড়ফড় করে উঠে বসল পারিজাত। এখনও ভোর হয়নি। আধখোলা জানালা দিয়ে আবছা আলো আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়াও আসছে। এদিকে শোঁ-শোঁ শব্দে মাথার ওপর ফ্যান চলছে। ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে যাচ্ছিল তার। কাঁপুনি ঠাণ্ডার, না উত্তেজনার? উঠে ফ্যানটা বন্ধ করল। ঝিম মেরে বসে রইল পারিজাত। কোথায় সে? চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকাল। ঝলকমোহন কোথায় গেলেন? মহাকাশযান তো নয়, সে তো এখন বিছানায়। তবে কি ঝলকমোহন তাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছেন? সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে—বিজ্ঞানী, মহাকাশযান, চাঁদ, শনি, শুক্র আর মঙ্গলগ্রহ—সব কিছু। সব কি স্বপ্ন! কান পেতে কি যেন শুনতে চাইল পারিজাত।

কীসের শব্দ?

বৃষ্টির। বাইরে তখনও ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে।



সাঙ্ঘাতিক বটে

সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ ঝলকমোহন চট্টরাজের বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল পারিজাত সেন। কেমন এক নিঃশব্দ পরিবেশ। বাড়িতে জনমনিষ্যি আছে কি না বোঝাই যাচ্ছে না। বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকবার পর



বিজ্ঞানীর নিজের তৈরি অটো সিস্টেমে গেট বন্ধ হয়ে গেল। নুড়ি পাথর বিছানো রাস্তা ধরে আসার সময়ই সে নৈঃশব্দ্য টের পাচ্ছিলো। একতলার বারান্দার সামনে এসে দেখলো কোলাপসিবলে তালা। সব গেল কোথায়? ভাবছিল পারিজাত।

এক মুহূর্ত ভাবলো পারিজাত। তারপর কলিং বেল টিপলো। একটা নরম মিউজিক সিস্টেম সারা বাড়ি জুড়ে বাজতে লাগল। মিনিটখানেক পেরিয়ে গেল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া এল না।

আশ্চর্য! কোনদিনই তো এমন ঘটনা ঘটেনি! বরং আমি এ-বাড়িতে ঢোকামাত্রই বিজ্ঞানীর কাছে খবর পৌঁছে যায়। কিন্তু আজ হলোটা কী?—ভাবছিল পারিজাত।

ফের সে কলিং বেলের বাটন টিপলো। আবার সেই মিউজিক সিস্টেম। এবার ওপর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। কেউ দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

নিমেষের মধ্যে লুল্লুরামের নাদুস-নুদুস চেহারাটা সে কোলাপসিবল গেটের ওপারে দেখতে পেলো। চাবির গোছার ঝনঝন শব্দ। গেট খুললো। পারিজাত ঢুকলো ভেতরে। ফের তালা দিয়ে দিল লুল্লুরাম।

কী হল? সব এত চুপচাপ কেন? পারিজাতের প্রশ্নের উত্তরে লুল্লুরাম বললো, ভেতরে যান। গেলেই বুঝতে পারবেন।

উনি আছেন কোথায়? ল্যাবরেটরিতে? নাকি তথ্যকেন্দ্রে?

না না। উনি কারখানায় নেই। বাগানবাড়িতেই আছেন।

ঝলকমোহন চট্টরাজের বাড়ির ছাদেই তাঁর বিরাট ল্যাবরেটরি। লুল্লুরামের কাছে সেটা হল কারখানা। আর তাঁর বাড়ির পেছনে ভেষজ উদ্যানের মধ্যেই বিজ্ঞানীর লাইব্রেরি ও রেকর্ডরুম। সেটা লুল্লুরামের কাছে বাগানবাড়ি।

ঝলকমোহন চট্টরাজের বাড়ির আনাচেকানাচে সবই পারিজাতের নখদর্পণে। লুল্লুরামের কাছে কথাটা শুনে নিয়েই সে ছুটলো বাড়ির পেছন দিকে। ভেষজ উদ্যানে নামলেই বুক জুড়িয়ে যায়। বিভিন্ন গাছের সবুজ পাতার সমারোহ চোখের আরাম এনে দেয়। নিম, আমলকি, বয়ড়া, কালোমেঘ প্রভৃতি গাছ, লতা-পাতার ভেতর দিয়ে লাল মোরামের সরু রাস্তা। সেই পথ ধরে পারিজাত পৌঁছে গেল বিজ্ঞানীর তথ্যকেন্দ্রে।

তথ্যকেন্দ্রের দরজার সামনে দাঁড়ালেই ভেতরে লাল আলো জ্বলবে। পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ শুনতে পাবে ভেতরে থাকা সবাই। এ-সব কারিকুরি বিজ্ঞানী ইদানীং করিয়েছেন। ফলে পারিজাত দরজার সামনে দাঁড়ানোমাত্রই বার্তা পৌঁছে গেল বিজ্ঞানীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই লুকনো মাইক্রোফোন থেকে বিজ্ঞানীর নিভাঁজ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

পারিজাত, ভেতরে এসো!

ঢুকে পড়লো পারিজাত। তথ্যকেন্দ্রের ভেতরটা অন্ধকার। কিন্তু তা মুহূর্তের

জন্য। হঠাৎই আলো জ্বলে উঠল। পারিজাত দেখলো, একটা সোফায় বসে বিজ্ঞানী মাথা চুলকোচ্ছেন। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। তাঁর মেজাজ যে প্রচণ্ড খিঁচড়ে আছে, তা পারিজাত ভালোই বুঝলো।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো! বিজ্ঞানী বললেন। পারিজাত বসলো। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। আর থাকতে না পেরে পারিজাত বলেই ফেললো, কী হয়েছে? সব এত চুপচাপ!

বিজ্ঞানী মুখ তুললেন। তাঁর চোখদুটো কেমন হলুদবর্ণ হয়ে আছে। মনে হয় মাথার চুলগুলো ধরে খামচেছেন। তাই অমন বিচ্ছিরি রকম উস্কোখুস্কো। শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন তিনি।

পারিজাত, সব্বোনেশে কাণ্ড হতে যাচ্ছে!

কোথায়?

এই পৃথিবীতেই।

পৃথিবীতে তো বুঝলাম। কিন্তু পৃথিবীর কোন জায়গায়?

পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে! তার আবার কোন জায়গা!

ঝলকমোহনকে দেখতে যেমন বিধ্বস্ত লাগছিল, তেমনি কণ্ঠস্বরেও ঝড়ে পড়ছিল চূড়ান্ত হতাশা। ধন্দ কাটাতে পারিজাত একটু উচ্চকণ্ঠেই বললো, ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে বলুন তো দেখি!

তা হলে ছাতে চলো।

চলুন।

ওরা তথ্যকেন্দ্রের ছাদে এসে দাঁড়ালো। বিজ্ঞানীর বিরাট মাপের টেলিস্কোপটা এখানে স্ট্যান্ডের সঙ্গে লাগানো। বিজ্ঞানী পকেট থেকে রিমোট বের করে আঙুল চালাতেই টেলিস্কোপের ফাইবারের ঢাকনা খুলে গেল। বিজ্ঞানী পারিজাতের দিকে হঠাৎই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

পৃথিবী থেকে ডাইনোসররা হারিয়ে গেল কেন, জানো?

ঠিক বলতে পারবো না।

আমিই বলছি। সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিলো গ্রহাণু বা অ্যাস্টরয়েড। তার বিস্ফোরণ অথবা সংঘাতজনিত কম্পনের ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি বৃহদাকার ডাইনোসররা। তাতেই ওরা শেষ হয়ে গেল।

এখন কি এমন কোনো ব্যাপার ঘটেছে?

তুমি ছোকরা এক্কেবারে রামবুদ্ধু! অমন একটা অ্যাস্টরয়েড যদি এতক্ষণে আছড়েই পড়ত এই পৃথিবীতে, তা'হলে কি আমি এই ভরদুপুরে তোমার সঙ্গে ভ্যাজোর ভ্যাজোর করতে পারতাম? বলিহারি যাই আর কি!

পারিজাত চুপ করে রইলো। তাতে ঝলকমোহন একটু নরম হলেন। বললেন, উনিশশো আট সালে রুশদেশের উত্তর সাইবেরিয়ার একটা জঙ্গলের মধ্যে অ্যাস্টরয়েড থেকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ড ছিটকে এসে আছাড় খেয়েছিল। সে একেবারে মাদারি কা খেল! কয়েকটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের শক্তি তার মধ্যে!

বিজ্ঞানী কোন্ পথে, কোন্ কথায় যেতে চান, তার একটা অস্পষ্ট আভাস পেয়ে গেল পারিজাত। মনে মনে বলল, লাগলে তুক, না লাগলে তাক্! শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে জোরের সঙ্গে বলল, এমন কোনো উল্কাপিণ্ড নিশ্চয়ই সৌরমণ্ডলের দিকে ছুটে আসছে!

এবার বিজ্ঞানীর চাহনি বেশ নরম হয়ে এল। বললেন, মাথাটা তোমার ক্লিয়ারই আছে। ধরেছো ঠিকই। কিন্তু আমি এবার করবো কী?

ব্যাপারটা নিয়ে একটা খোলামেলা আলোচনা না করলে আমি বুঝবোই বা কী?

তা হলে এসো। টেলিস্কোপে চোখ রাখো।

দুই

ভরদুপুর এখন। পারিজাত হাতঘড়ি দেখলো। বারোটা উনপঞ্চাশ। টেলিস্কোপের মুখ সূর্যের উল্টোদিকেই, অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম কোণ বরাবর। ঝলকমোহন নিজেই তখন টেলিস্কোপের নলে নিজের চোখ রেখেছেন।

আমি দিক নির্ণয় করে টেলিস্কোপের চোখ সেট করে দিয়েছি। দ্যাখো এবার।—বললেন ঝলকমোহন।

পারিজাত টেলিস্কোপে চোখ রাখলো। প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। অসীম নীলাকাশ যেন ঠিক তার মাথার ওপরেই। তবু মনকে স্থির করে নিজের চোখকে দিনের আকাশের সঙ্গে সে সইয়ে নিতে লাগল। অসীম মহাশূন্যে নক্ষত্ররাজিকে দেখতে গেলে মানসিক প্রস্তুতিও চাই। এই শিক্ষা সে মহাকাশ বিজ্ঞানী ঝলকমোহন চট্টরাজের কাছ থেকেই পেয়েছে।

হঠাৎই টেলিস্কোপের সামনে থেকে অমন সুন্দর নীল আকাশ ঝাপসা হতে হতে উধাও হয়ে গেল। কী হল! পারিজাত একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল।

অত দুশ্চিন্তার মধ্যেও এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ঝলকমোহন। বললেন, ঘাবড়ে গেলে তো?

মনের কথা কেমন করে যেন টের পেয়ে যান বিজ্ঞানী। পারিজাত সবসময়ই এ ব্যাপারটায় আশ্চর্য হয়ে যায়। বিজ্ঞানী ফের বললেন, টেলিস্কোপে চোখ রাখো আবার।



টেলিস্কোপে ফের চোখ রাখলো পারিজাত। বিজ্ঞানী জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখছো?

এবার বুঝলো পারিজাত। এক ঝাঁক সাদা তুলো মেঘ চলে এসেছে টেলিস্কোপ বরাবর। টেলিস্কোপে চোখ রেখে মনে হচ্ছে মেঘগুলো বুঝি

বিজ্ঞানীর ছাদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাসছে। তাই নীলাকাশ আড়াল পড়ে গেছে টেলিস্কোপের সামনে থেকে।

মিনিট চার পাঁচেকের মধ্যেই মেঘের ঝাঁক সরে গেল সামনে থেকে। ঝকঝকে আকাশ। ঝলকমোহন বললেন, এবার খুব ভালো করে লক্ষ করো পারিজাত। কিছু দেখতে পাচ্ছো কি?

পারিজাত গভীর মনোযোগের সঙ্গে আকাশ দেখছিল। পেছন থেকে বিজ্ঞানীর আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শুনলো সে।

একটা গ্রহাণু, নাকি কোনো গ্রহের বলয় থেকে ছিটকে আসা কিছু সৌরমণ্ডলের খুব কাছাকাছি ছুটে চলেছে বলেই মনে হচ্ছে। তুমি ভালো করে লক্ষ করো।

পারিজাত নিজের মনকে আরো সংহত করে টেলিস্কোপের আওতার মধ্যে থাকা আকাশটুকু দেখছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে তার মনে হলো বাঁ দিকের আকাশে একটু ওপরের দিকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি সূক্ষ্ম একটা কালো বিন্দু রয়েছে। কখনো সেটা দেখা যাচ্ছে, কখনো সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। পারিজাত টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো, একটা সূক্ষ্ম কণার মতো দেখলাম মনে হচ্ছে!

বাঁ দিকের আকাশের মাথায় তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক তাই।

ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক!

কেন?

চলো, নিচে গিয়ে বলছি।

ঝলকমোহন রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে টেলিস্কোপটি ফাইবার-ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন।

ঝলকমোহনের মূল বাড়ির পেছনে ভেষজ উদ্যান। ভেষজ উদ্যানের বাঁ দিকে রিসার্চ সেন্টার। রিসার্চ সেন্টারের মধ্যেও লম্বাটে ধরনের বেশ বড় দু'টো পাকা ঘর। এটা তাঁর রিসার্চ সেন্টারের তথ্যকেন্দ্র। এখানে আলমারি আর ওয়াল র‍্যাকগুলো নানা ফাইলে ভর্তি। ছাদ থেকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে পারিজাতকে নিয়ে রিসার্চ সেন্টারে নেমে এলেন বিজ্ঞানী। তথ্যকেন্দ্রের ঘরে ঢুকলেন। সুইচ টেপামাত্রই আলো জ্বললো। এবার দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে বললেন।

পারিজাত জানে, ঝলকমোহন এখানে কৃত্রিম সৌরমণ্ডল তৈরি করে

রেখেছেন। এই ঘরে এসে তিনি পটাপট কয়েকটা সুইচ টেপামাত্রই একটা আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি হলো। সামনের সাদা দেওয়ালে কৃত্রিম মহাকাশ ভেসে উঠল। ঝলকমোহন কথা বললেন।

যে চেনা সৌরজগৎ তোমার ধারণার মধ্যে আছে, আজ তোমাকে তা থেকে একটু অন্যরকম সৌরজগৎ দেখাবো। এই দ্যাখো, বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল শনি সব ঠিকই আছে। শনির বলয়ও আছে। তাই তো?

হ্যাঁ, ঠিকই আছে।

এবার দ্যাখো তো, এই তিনটে গ্রহকে চিনতে পারো কিনা?

না, না তো! এগুলোর চারদিকে বলয় রয়েছে দেখছি! এগুলো তো আর সৌরমণ্ডলের কোনো গ্রহ নয়!

হ্যাঁ, সৌরমণ্ডলেরই গ্রহ।

মানে! বলয়—

হ্যাঁ বলয়। এই তিনটি গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুন। এই গ্রহ তিনটিকে ঘিরেও শনির মতো বলয় রয়েছে।

তাই নাকি! আশ্চর্য!

আশ্চর্যের কিছু নেই। উনিশশো সাতাত্তর থেকে চুরাশি সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে পাঠানো মহাকাশযানগুলো ওই গ্রহ তিনটের যে ছবি পাঠিয়েছে, তা থেকে এ-ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই নতুন বিষয়টা জানানোর জন্যই আমি তোমাকে ডাকিনি। আমি ডেকেছি টেলিস্কোপে দেখা সেই অণুর মতো বিন্দুটির ব্যাপারে কী করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করতে।

তিন

নতুন এতবড় খবরটা যদিও তখনো হজম করতে পারেনি পারিজাত, তবু সে বললো, বলুন, ওই বিন্দুটা কেন আপনাকে চিন্তায় ফেলেছে?

ইরেগুলার মুন্‌স বলে কিছু শুনেছো কি?

না।

হাওয়াই ইউনিভার্সিটি ও কার্নেগি ইনস্টিটিউটের গবেষকরা দূরবীন দিয়ে যখন তন্নতন্ন করে খুঁজে চলেছেন শনির বলয়ের রহস্য, তখনই তাঁরা এই আশ্চর্য ব্যাপার স্যাপার লক্ষ্য করলেন।

কী সেটা?

তাঁরা দেখলেন, শনির চারদিকে ডজনখানেক ছোট ছোট চাঁদ। এবং তিন থেকে সাত কিলোমিটার ব্যাসের ওগুলি সত্যিই এক একটি উপগ্রহ বটে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার অন্য জায়গায়।

কেমন?

বৈচিত্র্যময় উপগ্রহ বলা চলে ওগুলোকে। বৃত্তাকার ঘুরছে না ওগুলো। ওদের কক্ষপথ অনেকটাই উপবৃত্তাকার। এই নতুন আবিষ্কৃত উপগ্রহগুলির এগারোখানাই আবার ঘুরছে শনিগ্রহের আহ্নিকগতির উল্টোদিকে, এগুলোকেই ইরেগুলার মুন্‌স বললেন ওঁরা।

সত্যিই তো! ব্যাপারটা বেশ ইন্টরেস্টিং! কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা কি আপনি দিতে পারেন?

আমি ওটা নিয়ে চর্চা করছি না। ব্যাখ্যাও দিতে পারবো না। আমি টেরা ফর্মিংয়ের বাইরে অন্য বিষয়ে মাথা গলাতে চাই না।

তবে এসব কথা আসছে কেন?

ফের তোমার উজবুকের মতো কথা! আমার টেলিস্কোপে যদি ওই কালো বিন্দুটা ধরা না পড়তো, তা হলে ভারি আমি এইসব ছোটখাটো বিষয়ে মাথা গলাতাম! তবু জানতে চাইছো যখন, তখন হাওয়াই ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর ডেভিড জিউইটের মন্তব্যটুকু বলেই আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করবো।

ঠিক আছে। তাই হোক।

মিস্টার জিউইট জানিয়েছেন, সৌরমন্ডলের অন্যান্য গ্রহগুলোর মতোই সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে শনি যখন গলন্ত অবস্থা থেকে গোলাকার পিণ্ডে পরিণত হচ্ছিল, তার থেকে কিছু টুকরো বোধহয় শূন্যেই রয়ে যায়। সেগুলোই সম্ভবত এই খুদে উপগ্রহ। আর একটা মতও উনি রেখেছেন।

কী?

কুইপার বেল্ট এলাকা থেকে শনিগ্রহের প্রবল আকর্ষণে ওই টুকরোগুলো ছুটে আসতে পারে এবং শনির নিজস্ব বৃত্তে জায়গা করে উপগ্রহের পরিণতিতে পৌঁছোতে পারে। যাই হোক, আমি এবার এখনকার জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কথা বলবো।

তার আগে আমি দু'টো বিষয়ে পরিষ্কার হতে চাই। এক, আপনার দূরবীনে ধরা পড়া বিন্দুটি কি গ্রহাণু থেকে ছিটকে আসা উল্কাপিণ্ড? নাকি কোনো ইরেগুলার মুন। আপনি কী মনে করছেন?

গতকাল রাতে যখন আমার টেলিস্কোপে এই বিন্দুটা ধরা পড়ল, প্রথমে আমি ততটা গুরুত্ব দিইনি। ক্যাসিনি থেকে পাঠানো শনি সম্পর্কে নতুন নতুন ইনফরমেশনগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি শনি আর শনির বলয়ের দিকেই বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়েছিলাম। তখনই এই বিন্দুটা বারে বারে দৃষ্টির মধ্যে চলে আসছিল।

তার মানে আপনি অবহেলা করলেও ওই বস্তুটা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ছটফট করছিল।

তা-ই বলতে পারো। তবুও তখন আমি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে টেলিস্কোপ বন্ধ করে নিচে নেমে এসেছিলাম। কিন্তু আজ ভোরে যখন আমি আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে তথ্যকেন্দ্রের ছাতে উঠলাম, চমকে গেলাম তখনই।

কী দেখলেন তখন?

সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

সাঙ্ঘাতিক কেন?

গত রাতের অবস্থান থেকে সেটা সরে এসেছে। পৃথিবীমুখিই তার গতি।

ভয়ঙ্কর কথা!

ভয়ঙ্করই বটে। ওটা যদি এই গতিতে ছুটে আসতে থাকে, তা হলে আগামী এক পক্ষকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে।

তা হলে ওটা ইরেগুলার মুন না উল্কাপিণ্ড, সেটা কি আপনি বুঝতে পারছেন?

এই সময় কোনো উল্কাপিন্ডের খবর আমার জানা নেই। হুট করে তা উদয়ও হয় না। শনির সমান্তরালেই ওটা পৃথিবীমুখি ছুটছে। আমি অনুমান করতে পারি, বিন্দুটা শনির একডজন ছোট চাঁদের একটা হতে পারে। উপবৃত্তাকার বিচিত্র গতিপথ থেকে ছিটকে এসে খুব সম্ভবত ওটা শনির বলয়ের ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরে চলে এসেছে। আর একটা কারণও হতে পারে।

কী হতে পারে আরেকটা?

যে কোন্ গ্রহের বলয়ের মধ্যে মহাকর্ষের সূত্র অনুযায়ী আকর্ষণ নাও হতে পারে।

তা হলে কী হবে?

বিকর্ষণ হবে। আর এই বিন্দুটার ক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় মত হলো বলয়ের অভ্যন্তরীণ বিকর্ষণ ক্রিয়ার ফলে সেখান থেকে কোনো একটা বড়সড় টুকরো ছিটকে বেরিয়ে লাফ দেয়। সেটি ইরেগুলার মুনের সাইজেরই হবে। এবং

সেটি সৌরমন্ডলের মধ্যে নিজস্ব গতিতেই ছুটতে লেগেছে।

সেটার গতিমুখ পৃথিবীর দিকে, এটাই আপনি বলতে চাইছেন?

আরে বাবা টেলিস্কোপে তুমিও তো তাই দেখলে! শিয়রে শমন এসে ঝুলছে, আর আমি শুধু বকেই যাচ্ছি। যত্তো সব!

আমার মনে হয়, প্রথমেই বড় বড় দেশের মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে আপনার মেসেজ পাঠানো উচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতামত নিয়ে ওটাকে রুখবার জন্য যৌথ উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

তোমার এই পরামর্শে আমি খুব একটা স্যাটিসফায়েড হতে পারলাম না।

কিন্তু এত বড় একটা বিপদের মুখে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নেওয়াটা জরুরী নয় কি?

কারা অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী? ওরা কি আমার থেকে বেশি বোঝে? না কি বেশি জানে? আমি আমার নিজের স্পেসশিপ নিয়ে লেজার বিম দিয়ে ওই আগন্তুক গ্রহকে টিট করে দেবো। ওইসব স্টান্টবাজ বিজ্ঞানীদের আমি পরোয়া করি নাকি!

পারিজাত ঝলকমোহনের মতিগতি ভালোই বোঝে। নিজের কাজ ও আবিষ্কার সম্পর্কে তিনি দ্বিধাহীন। কারও ধার ধারেন না। তাই সে বললো, ঠিক আছে, আপনি যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন। আমাকে কি করতে হবে, বলবেন, করে দেবো।

তবে তুমি এখন বাড়ি চলে যাও। চান-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেল সাড়ে চারটে পাঁচটার মধ্যে চলে এসো।

চার

পারিজাত বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফের যখন ঝলকমোহনের বাড়িতে গেল, লুল্লুরাম কোথা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল।

কী হয়েছে?

তাড়াতাড়ি এসো তো! বাবু বোধহয় পাগল হয়ে গেছেন!

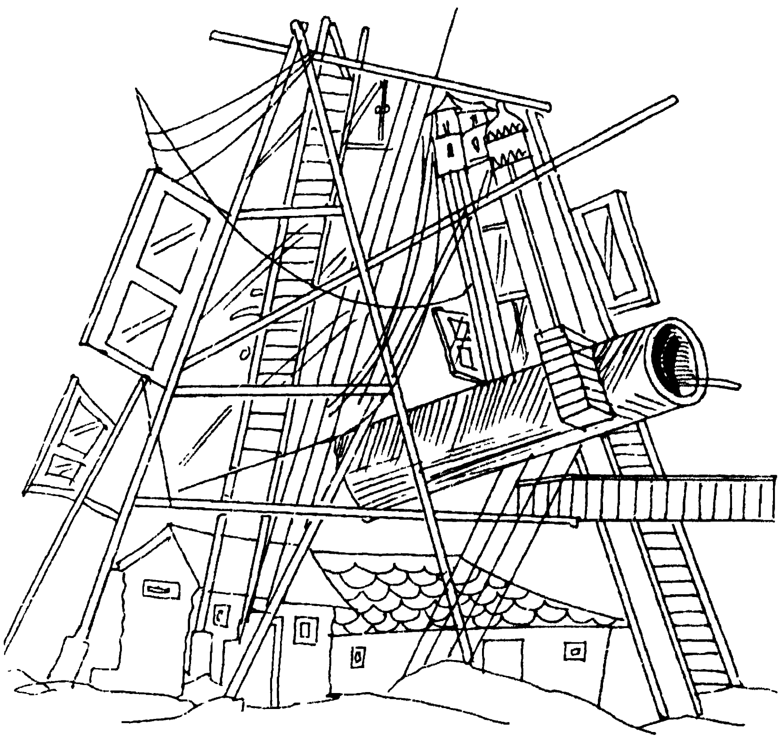
কোথায় আছেন?

বাগানবাড়ির কোঠাঘরে বসে বিড়বিড় করে কী সব বলে চলেছেন। চোখ দুটো টকটকে লাল। আমি কাছে গেলেই খিঁচিয়ে উঠে তাড়া করছেন। বুড়ো বয়েসে পুরো ভীমরতিতে পেয়েছে।

পারিজাত ছুটলো রিসার্চ সেন্টারের দিকে। সেখানে তথ্যকেন্দ্রের সামনে দাঁড়ানোমাত্রই পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ।

ভেতর থেকে ঝলকমোহনের ভাঙা হতাশ কণ্ঠ ভেসে এলো, ভেতরে এসো!

ভেতরে ঢুকে বিজ্ঞানীর চেহারার ছিরি দেখে চমকে গেল পারিজাত। চুলগুলো খামচে খামচে বাবুই পাখির বাসার মতো করে ফেলেছেন। চোখ দুটো সত্যিই টকটকে লাল। জামার ওপরের দুটো বোতাম ছেঁড়া।



তাড়াতাড়ি বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, হলোটা কী?

সর্বনাশ হয়েছে!

শুনি না, কী হয়েছে?

ওটা পৃথিবীর আরো কাছে নেমে এসেছে। আরো বড় লাগছে। অস্পষ্ট একটা ডানার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ডানা? অদ্ভুত ব্যাপার!

ইরেগুলার মুনের সবকিছুই অদ্ভুত। আকৃতি থেকে শুরু করে গতিপথ সবই। মোট কথা, আমাদের পৃথিবীর সামনে ঘোর বিপদ! যা করবার আজ রাত্তিরের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। কিন্তু আমার স্পেস শাটল্‌কে ছুটবার জন্য তৈরি করে তুলতে প্রায় পনেরো ঘন্টা সময় দরকার। তবে অন্যান্য কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে। স্পেস কামানে লেজার বিম ভরতে হবে। চলো, আগে ওপরে চলো। পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিই তোমাকে।

সন্ধে নামছিল। ছাদে উঠেই বিজ্ঞানী রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে টেলিস্কোপের ফাইবার-ঢাকনা খুলে দিলেন। নিজেই একবার তাতে চোখ রাখলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ দেখে হাতের ইশারায় পারিজাতকে কাছে আসতে বললেন।

পারিজাত এবার টেলিস্কোপে চোখ রাখলো। উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবরই টেলিস্কোপের এক চক্ষু স্থির হয়ে আছে।

চল্লিশ সেকেন্ডের মতো সন্ধের আকাশের দিকে চোখ রেখেছিল পারিজাত। তারপরই কিছু একটা দেখে তার ভুরু কুঁচকে গেল। একটা সন্দেহ ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সে টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বিন্দুটা প্রথম কখন দেখেছিলেন বলুন তো?

গতকাল রাতে।

তারপর ওটাকে সরে যেতে দেখলেন কখন?

আজ ভোরে দেখলাম, ওটা পৃথিবীমুখি আরো সরে এসেছে!

আজ দুপুরে আপনি যখন আমাকে বিন্দুটা দেখালেন, সেটা কি তখন ভোরের অবস্থানেই ছিলো?

হ্যাঁ, তাই ছিলো।

এখন এই মুহূর্তে সেটা কোথায় আছে?

অবস্থানটা একই জায়গায় আছে। কিন্তু সাইজে বড় লাগছে। মানে ওটা আমাদের আরো কাছে চলে এসেছে। ডানার মতো জিনিসটা দেখতে পেয়েছো তো?

পেয়েছি। তাইতেই তো ডাউট হচ্ছে।

কী ডাউট হচ্ছে?

টেলিস্কোপের মাথাটা একটু দেখা যাবে?

তা যাবে। কিন্তু কেন?

আমার মনে হচ্ছে, ওটা কোনো উল্কাপিন্ড বা ইরেগুলার মুন নয়।

তা হলে কী?

টেলিস্কোপটা দেখতে হবে আগে।

ঝলকমোহন টেলিস্কোপের স্ট্যান্ডের জোড়ায় থাকা একটা লিভার আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগলেন। আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকা টেলিস্কোপ মাথা নামালো। পারিজাত এগিয়ে গিয়ে টেলিস্কোপের সামনের অংশের কাচ খুব ভালো করে দেখতে লাগল। কিন্তু খালি চোখে সে কিছুই দেখতে পেলো



না। তখন সে জামার পকেট থেকে রুমাল বার করে টেলিস্কোপের সামনের কাচ ঘষে ঘষে যত্ন করে মুছে দিল। এবার বিজ্ঞানীকে বললো, স্যার, আপনি এটাকে আগেকার সেম অ্যাঙ্গেলে সেট করে দিন। দেখা যাক।

ঝলকমোহন প্রায় উন্মাদের মতো আচরণ করছিলেন। বিড়বিড় করে বকতে বকতে তিনি ফের সেই লিভারটা ঘুরিয়ে টেলিস্কোপকে আগেকার নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে নিয়ে গেলেন। পারিজাত তাড়াতাড়ি করে তাতে চোখ রাখলো। প্রায় মিনিট দুয়েক। বিজ্ঞানী তো একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। নিজের চুলগুলো দু'হাতে খামচাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে

চিৎকার করে উঠলেন, কী হলো? ওহে যুবক, কী দেখতে পাচ্ছো? ওটা কি আরো এগিয়ে এলো?

পারিজাত টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। বললো, আসুন, আপনি নিজেই দেখুন!

তড়িঘড়ি করে দূরবীনে চোখ রাখলেন ঝলকমোহন। দু'মিনিট, তিন মিনিট চলে গেল, তিনি নানাভাবে সেই মহাকাশীয় বিন্দুটি দেখার চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত চোখ সরিয়ে নিলেন। হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, ওটা নেই।

হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছেন। ওটা নেই। মহাকাশে, শনির সমান্তরালে পৃথিবীমুখী কোন বস্তুই ছিল না।

কী সব যা তা বকছো! তুমি নিজেও তো দেখেছো!

দেখেছি। ওটা ছিল টেলিস্কোপের কাচে। কোন ক্ষুদ্র পোকা, ব্যাকটিরিয়া-জাতীয়। খালি চোখে দেখা যায় না। টেলিস্কোপের কাচে বিন্দুর আকার পেয়েছে। ডানা দেখেই আমার ডাউট হল।

কিন্তু—

কিন্তু টিন্তু কিছু নয়। কাল রাতে ওটা জীবন্ত ছিল। কাচের ওপর খানিকটা হেঁটেছে। তাই আজ সকালে আপনার মনে হয়েছে, পৃথিবীর দিকে ওটা আরো খানিকটা এগিয়েছে। ওটুকু এগিয়েই ওটা মরে গেছে। তাই সকালের পরে এখনো পর্যন্ত ওটা আর অবস্থান পাল্টায়নি। মরে গিয়ে ঠ্যাঙ ছেতরে গেছে। সেটাকেই আপনি উপগ্রহের ডানা ভেবেছেন। তাতে একটু বড় লাগছে বলে ভাবছেন, ওটা পৃথিবীর আরো কাছে চলে এসেছে। ব্যস! ক্লিয়ার?

বিজ্ঞানী ঝলকমোহন আর কোনো কথা বললেন না। তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতের রিমোট দিয়ে টেলিস্কোপের ঢাকনা আটকে দিলেন। তারপর মাথাটা জোরসে ঝাঁকালেন। বললেন, চলো!

সে কি ছুট্ বিজ্ঞানীর! ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে, ভেষজ উদ্যানের মধ্যেকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে সোজা মূল বাড়ির ড্রইংরুমে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন সোফায়। তারপর বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠলেন।

লুল্লুরাম!

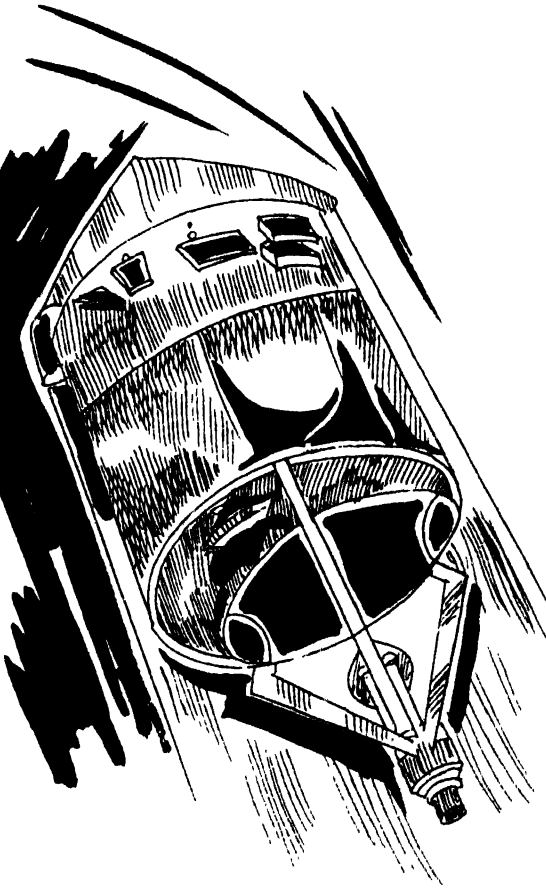
ছুটে এলো লুল্লুরাম। ফের হাঁক পাড়লেন তিনি।

দু'প্লেট সিঙাড়া! আর দুটো কফি।

লুল্লুরাম এবার পড়িমড়ি ছুটলো কিচেনে।

ন্যানোযানে ঝলকমোহন

ভেষজ এনার্জি নিয়ে শুধু একমুখী চিন্তা করলেই হবে না।—বললেন ঝলকমোহন চট্টরাজ। এই মন্তব্যের কোনো গূঢ়ার্থ উদ্ধার করতে না পেরে পারিজাত



ক্যাবলাকান্তের মতো তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে।

অমন ফ্যালফ্যাল করে দেখছো কী? আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারলে কিছু?

না, মানে, এখানে আর বোঝার কী আছে। ভেষজ এনার্জিকে সম্ভবত আপনি আরো সূক্ষ্ম পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছেন।

সূক্ষ্ম পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাওয়া বলতেই বা তুমি কী বোঝাতে চাইছো?

পারিজাত এবার চুপ করে রইলো।

কী হলো? একেবারে স্পিকটি নট হয়ে গেলে যে?

কিন্তু স্যার, এটা সত্যিই, এই গ্রহের বাইরে এখনও পরিষ্কারভাবে জীবজগতের খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ বলছেন, ওখানে প্রাণের অস্তিত্ব ছিলো। কেউ বলেছেন, সেখানে একদিন জল ছিলো। কেউ বলেছেন, ওমুক জায়গায় হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, মিথেন—

আরে থামো তো বাপু! অত ফিরিস্তি শুনে কী হবে? সোজা কথাটাই বলো না!

মঙ্গলেই বা টেরা ফর্মিং হলো কোথায়? আপনার ইউরোপাতেই বা মানুষের থাকার কি এমন বন্দবস্তো হলো?

আমার ইউরোপা! বেড়ে বলছো হে! ইউরোপাতে টেরা ফর্মিং নিয়ে আমি ভাবছিলাম বটে। তবে ইউরোপা আমার নয়। আমাকে ঠুকে কথা বলে কিচ্ছুটি লাভ হবে না।

বিতোনী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে হয়, চিন্তার স্কেলটাকে ঊর্ধ্বমুখি করে যাচ্ছিলেন। এবার কথা বললেন।

ভেষজ এনার্জিকে আমি মহাকাশযান চালানোর উপযোগী করেছি ঠিকই, কিন্তু সৌরজগতের মধ্যে কোন কাজেব কাজ করার মতো এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু হলো না।

তবে?

সেই জন্যই গবেষণার পর্বটাকে আরো সূক্ষ্ম স্তরে নিয়ে যাচ্ছি আমি।

কী রকম?

'ন্যানো' কথাটা শুনেছো?

ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে তো জোর আলোচনা হচ্ছে ইদানীং।

ওরে ব্বাস! শুনেছো তা হলে? আমি তো তাই নিয়ে নীরবে-নিভৃতে কাজ করছি।

আমাকে তো বলেননি? এতদিন ধরে আপনার সঙ্গে আছি!—পারিজাতের কণ্ঠে অভিমানের ছোঁয়া।

আরে সবুর সবুর! তোমাকে না বলে আর যাবো কোথায়? কাজটা যথেষ্ট

এগিয়েছে। তোমাকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যই আজকের দিনটা বেছে নিলাম।

কেন? আজকের দিনটা কী?

আজ দুপুরের পর থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে প্রবল দুর্যোগ শুরু হয়ে যাবে। বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে গভীর সমুদ্রের আকাশে শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। সাঙ্ঘাতিক ঝড় আসছে। যে সে ঝড় নয়, সাইক্লোন প্যাটার্নের ঝড়। এটাই আমার সুবর্ণ সুযোগ। কাজটা তো করে ফেলি। রাখে হরি মারে কে? আর হরি যদি মারেই, কিচ্ছু বলার নেই।

উদ্দীপনায় বিজ্ঞানীর মুখ চকচক করে উঠেছে। এই রকম স্মার্ট এবং দুরন্ত চেহারা তাঁর অনেকদিন দেখেনি পারিজাত। গত ছ'মাস ধরে ঝলকমোহনের মতিগতির সঠিক হদিস করতে পারছিলো না। ভেতরে ভেতরে তিনি কিছু কলকাঠি নাড়ছিলেন, তার একটা আভাস শুধু আঁচ করত পারছিলো সে। কিন্তু ন্যানো টেকনোলজির সঙ্গে মহাকাশের সুদূরতম গ্রহে টেরা ফার্মিংয়ের কী সম্পর্ক, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না পারিজাত। তবে এটা বুঝলো, স্যারের নতুন আইডিয়া শুধুই মগজে সীমাবদ্ধ নেই। হাতে-কলমে বোধহয় ষোলো আনাই এগিয়েছেন। তাই তাঁর অভিব্যক্তিতে এমন আত্মবিশ্বাস, ঔজ্জ্বল্য আর স্মার্টনেসের ছাপ। গবেষণায় সাফল্য পেলেই তিনি শিশুর মতো ছটফটে হয়ে ওঠেন।

কিন্তু স্যার, টেরা ফর্মিং আর ন্যানো টেকনোলজির সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোথায় সম্পর্ক?—রয়ে সয়ে প্রশ্নটা করেই ফেললো পারিজাত।

সময় হোক, টের পাবে।

সময়টা কখন হবে?

বিকেল চারটে থেকে সোয়া চারটের মধ্যে।

তখন ঈশান কোণে সবে এক টুকরো ঘন কালো মেঘ দেখা যাচ্ছিলো। নিরীহ তার চেহারা। বিজ্ঞানী বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে মেঘটাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। পারিজাতকে বললেন, দ্যাখো, ওই যে!

কী?

কালো মেঘের টুকরো।

তাতে কী?

ওটা এক্ষুনি আকাশ ছেয়ে ফেলবে। প্রথমে বৃষ্টি, তারপর ঝড়। তারপর ঝঞ্ঝা-তুফান উড়িয়ে নিতে চাইবে সবকিছু। তখনই আমার 'ন্যানো অভিযান' শুরু হবে।

ন্যানো অভিযান?

হ্যাঁ, এত সংশয় কীসের তোমার?—এই বলে বিজ্ঞানী ঝলকমোহন চট্টরাজ রহস্যময় হাসি হাসলেন।

দুই

এই তো একটু আগেও পরিষ্কার দিনের আলো ছিলো। কিন্তু মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে একেবারে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। কালো মেঘের ঘনস্তর পরতের পর পরত সাজিয়ে দিয়েছে আকাশে। ভয়ঙ্কর কালো! আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপে উঠলো পারিজাতের। জমাট কালো মেঘের এমন ভয়াবহ রূপ আগে কখনো দেখেছে, তার মনে পড়লো না। মিশমিশে কালো মেঘ পুব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ আলুথালুভাবে পাকিয়ে উঠছিলো। পারিজাত অস্ফুটে বলে উঠলো, কি ভয়ঙ্কর!

দশ মিনিটের মধ্যেই বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হলো। মুহূর্ত কয়েক মাত্র। তারপর একেবারে আকাশ ভেঙে পড়লো। দশ বিঘে জমির ওপর বিজ্ঞানী ঝলকমোহনের চারতলা বাড়ি, তথ্যকেন্দ্র, ল্যাবরেটরি, ভেষজ উদ্যান, সামনের দিকে ফুলের বাগান জল থই-থই হয়ে গেল। ছোট ছোট গাছগুলো বৃষ্টির চোটে একেবারে নুয়ে পড়লো মাটিতে। তারপরই ঝড়ের দাপাদাপি শুরু হলো। সেই ঝড় ক্রমশ বাড়ছে। তা বাড়তে বাড়তে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো, পারিজাতের মনে হচ্ছিলো, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে বুঝি বা।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ঝড়ের সেই প্রচণ্ড উৎকট দাপাদাপির মধ্যেই বিজ্ঞানী হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তিনি চিৎকার করে বললেন, আমি এরকমই চাইছিলাম। আর দেরি নয়। চলো এবার, যাই!

কোথায় যাবো?

আরে চলোই না! জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আর কখনো হবে না। কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও নয়।

বলেই পারিজাতের ডান হাতটা শক্ত করে ধরে বিজ্ঞানী বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। এ দরজা সে দরজা পেরিয়ে বিজ্ঞানী তাকে বাড়ির অনেকটা ভেতরে নিয়ে গেলেন। এখানটা চৌকো উঠোনের মতো। এ পর্যন্ত পারিজাতের চেনা। বিজ্ঞানী দেওয়ালের একটা সুইচ টিপলেন। ঘড়ঘড়-ঘড়ঘড় শব্দ। ওদের মুখোমুখি একটা কাঠের পাটাতন খুলে গেল। পারিজাত দেখলো,

ওই উন্মুক্ত স্থান দিয়ে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। বিজ্ঞানী বললেন, এসো।

ঝলকমোহনের পেছন পেছন পারিজাত সেই সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে লাগলো। ঘোরানো সিঁড়ি। এই বাড়ির মধ্যে এত কিছু আছে, সে নিজেও জানে না। ঘড়ঘড়-ঘড়ঘড় শব্দ করে সেই কাঠের পাটাতন বন্ধ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িটা অদ্ভুত লাল আলোয় ভরে গেল। অনেকটা নিচে নামলো দু'জন। সিঁড়ি শেষ হলো নিরেট এক দেওয়ালের সামনে। সেই দেওয়ালে বিজ্ঞানী হাত ছোঁয়ানো মাত্র সরে গেল দেওয়াল। একটা ঘর। দুজনে ঢুকলো তাতে। দেওয়াল বন্ধ হয়ে গেল। এই ঘরে কমলা রঙের আলো। দেওয়ালের র‍্যাকে থরে থরে সাজানো নানা কেমিক্যাল ভর্তি কাচের বোতল। নৈঃশব্দ্য ভেঙে ঝলকমোহন কথা বললেন।

'ন্যানো' কথাটা কি জানো?

কোন বস্তুকে খুব ছোট করে ফেলা।

কতটা ছোট?

জানি না।

ন্যানোর অর্থ হলো একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। আমি তৈরি করেছি তেমনই ন্যানো রোবট এবং ন্যানো মহাকাশযান।

কোথায় সেটা?

তুমি কি তা খালি চোখে দেখতে পাবে নাকি!

কী করে দেখা যাবে?

ন্যানো প্রযুক্তি প্রয়োগে নিজেকেও ন্যানো-মানব হতে হবে।

ওরে বাবা!

কেন, তুমি যে এমন গ্রহের খোঁজ করছিলে, যেখানে প্রাণ আছে? এই প্রযুক্তি দিয়ে আমরা সেখানেই পৌঁছতে চাই।

সেটা কী করে?

মাইক্রনের লেভেলটা জানো?

জানি। এক মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

আর ন্যানো মিটার হচ্ছে এক মিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। আমার মহাকাশযানকে আমি সেইভাবেই সঙ্কুচিত করেছি।

করেছেন! করা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ রে বাপু। অত ভ্যাবাচ্যাকা খাবার কী আছে? সবই তো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বাইরে গিয়ে অলৌকিক কিংবা আধিভৌতিক কিছু তো করিনি!

আমার ভেষজ জ্বালানিকে তেমনি ন্যানো পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছি আমি। এগুলোকেই একত্রিভূত করে আমি সেই অজানা জগতে পৌঁছতে চাই, যেখানে প্রাণ আছেই আছে।

আপনি স্যার এই কাজে ন্যানো টেকনোলজির সাহায্য নিচ্ছেন কেন?

সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্মতম পর্যায়ে যদি তুমি জটিল ও বিশাল মাপের কাজগুলো করে সফল হতে পারো, তবে তাতে যে কি পরিমাণ লাভবান হবে তা ভাবাও যায় না।

কিন্তু স্যার পৃথিবীতে এখনো অবধি ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে অনেক গল্প-আলোচনা হয়েছে। যতদূর জানি, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা দু'এক কদম এগিয়েছেন কি না সন্দেহ।

ওই সব হতচ্ছাড়া স্টান্টবাজ সায়েন্টিস্টদের কথা ছাড়ো তো! ওদের সঙ্গে আমরা তুলনা? ওরা শুধু বুক্‌নি ঝেড়ে যাচ্ছে। আমি কাজ বুঝি, সোজা বাংলায় পারফেক্ট কাজ। সে কাজ আমি করে ফেলেছি। তবে সত্যি কথা বলছি শোনো!

কী কথা?

পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের চিন্তা আর কল্পনা আমাকে 'ন্যানো' নিয়ে ভাবতে সাহায্য করেছে। উনি নোবেলও পেয়েছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনিই প্রথম আইডিয়া দিয়েছিলেন পরমাণুকে একশো কোটি ভাগে ভাগ করার। সেই পরমাণুর ভগ্নাংশগুলিকে ইচ্ছেমতো সাজিয়ে তুমি তোমার পছন্দমতো যা খুশি তাই তৈরি করতে পারো। ফাইনম্যানের সেই চিন্তাকে আমি বাস্তবে হাজির করেছি।

ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেদের পরমাণু পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে আমরা যে মহাকাশ অভিযানে নামছি, তার সময়সীমা কত?

সময়কেও একশো কোটি ভাগের এক ভাগ ধরে একক করতে হবে। কাজেই গতি যে কোথায় যাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ-সব কথাবার্তা শুনে পারিজাত বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছিলো। ভাবছিলো, স্যার যা বলছেন, তা কল্পনা করতেও হৃৎকম্প হবার জোগাড়।

কী বুঝছো?

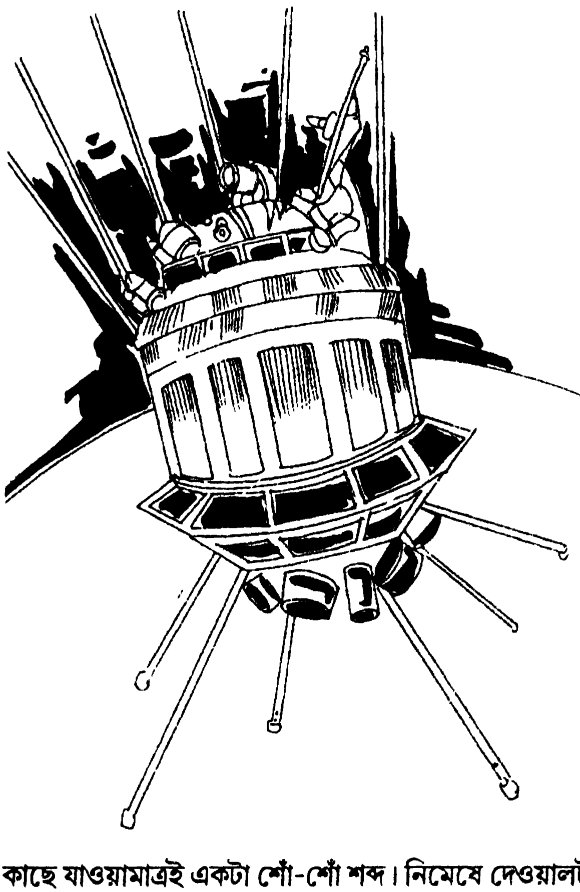
হঠাৎ এমন প্রশ্নে সামান্য থতমত খেয়ে পারিজাত বললো, কিছুই বুঝছি না স্যার।

হুম্। সবই বুঝবে এবং তা প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগের মধ্যে। নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি রাখো বা তৈরি হতে থাকো।

এক্ষুনি?

হ্যাঁ, এক্ষুনি। তুমি অভিমান করছিলে, তোমাকে আমার ন্যানো টেকনোলজি গবেষণার কোনো খবর জানাইনি বলে। এখন তো তোমাকে নিয়েই ন্যানো-শাটলে চেপে সাত নক্ষত্রলোক আর তেরো সৌরজগৎ পাড়ি দেবো। জেনে নেবে সব কিছু! চলো, আর একটুও দেরি করবো না।

পারিজাতের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। যে দেওয়ালটা ফাঁকা ছিলো, সেই



দেওয়ালের কাছে যাওয়ামাত্রই একটা শোঁ-শোঁ শব্দ। নিমেষে দেওয়ালটা নেই। জাদুকরের মতো মায়াবী কণ্ঠে বিজ্ঞানী ডাকলেন, এসো পারিজাত, অন্য এক যুগে, অন্য এক সময়ে, অন্য এক রূপে চলে যাবো আমরা।

সামনে বিরামহীন ধোঁয়া ছুটে বেড়াচ্ছে। স্থির নয়। ন্যানো জগতের প্রথম ধাপে পৌঁছোলাম, বিজ্ঞানী বললেন। পারিজাতের মনে হচ্ছিলো, শরীরটা তার আছে ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন। কেমন, সে নিজে বলতে পারবে না। তার

চারপাশে সাদা ধোঁয়ার রঙ সুন্দর নীল রঙে পরিণত হচ্ছিলো। নরম মখমলের মতো সেই নীল ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে সে সামনে দেখলো দুটো অদ্ভুত রকমের স্বচ্ছ চেয়ার, কিন্তু মনে হচ্ছে খুবই কঠিন। বিজ্ঞানী কথা বললেন।

আমরা দু'জনে ওই দুটো সিটে বসবো। আগে জেনে নাও পারিজাত, আমার ন্যানোটেক নক্ষত্রাভিযান একসঙ্গে দুই কাজ করবে। অপারেশন শুরু হয়ে গেলে যাওয়া এবং আসা দুই ভ্রমণই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে। আমাদের সামনে থাকবে না কোনো বাধার প্রাচীর। মহাকর্ষ-অভিকর্ষীয় বল কিংবা নক্ষত্রের ভরের বিশাল টান টেরই পাবো না। পরমাণুর এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতা সবাইকে ডোন্ট কেয়ার করে ছুটে যাবে আমার নির্দিষ্ট লক্ষে।

সেটা কোথায়?

আমরা যাবো '581 সি' তে।

581 সি?

হ্যাঁ। আমরা ওখানেই যাবো।

পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব তো জানি কুড়ি আলোকবর্ষ!

হুঁ। পড়াশোনা করেছো তাহলে?

হ্যাঁ। খবরের কাগজ আর সায়েন্স জার্নাল পড়ে জানলাম।

তাহলে জানোই তো ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির ডজন খানেক গবেষক এই গ্রহটার খোঁজ দিয়েছেন। ওটা নাকি একটা লোহিত নক্ষত্রের চারপাশে একবার করে পাক খাচ্ছে পৃথিবীর সময় অনুযায়ী তেরো দিনে। তাই ওখানে তেরো দিনেই বছর। ওঁরা লোহিতবর্ণের নক্ষত্রের নাম দিয়েছে 'গ্লিসে-581'। তা হলে তুমি কি বুঝতে পারছো 581 সি গ্রহে কেন যেতে চাই?

বিজ্ঞানীরা তো বলছেন, ওখানে জল আছে। প্রাণ থাকলেও থাকতে পারে।

দেখা যাক। সিটে বসে পড়ো। ঘুরে আসি। কতক্ষণেরই বা ব্যাপার! যেন বাস বা অটোতে বসেছেন, এভাবেই বললেন ঝলকমোহন।

শরীরটাকে প্রায় মালুমই। হচ্ছিল না। সেই শরীর নিয়ে পারিজাত বসলো সেই স্বচ্ছ চেয়ারে। বিজ্ঞানী বললেন, আমরা এই নিশ্চিদ্র গবেষণাগার থেকে সূক্ষ্মতম এই মহাকাশযান একটা চ্যানেল দিয়ে এক ধাক্কায় সৌরজগতের সীমানা পেরিয়ে যাব! সেই চ্যানেল খুঁজে পাওয়া মানুষের কম্মো নয়। তারপর দেখা যাক। রেডি পারিজাত!

হ্যাঁ। রেডি!

তিন

একটা ধাক্কা। কিছুক্ষণের জন্য অনুভবহীনতা। তারপর ধীরে ধীরে ঘোর কেটে গেল। চারধারে সে দেখলো সীমাহীন শূন্য। পারিজাত ওর শরীরটা দেখতে পাচ্ছিলো না। কিন্তু সে মহাশূন্যের সবই দেখতে পাচ্ছে। মহাকাশের, ব্রহ্মাণ্ডের, ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে আশ্চর্য নক্ষত্রলোকের সব কিছু। ওর পাশে কি বিজ্ঞানী বসে আছেন? ও জানে না। বিজ্ঞানী বোধহয় ওর মনের কথা টের পেয়েছেন। তাই পাশ থেকে তাঁর কথা ভেসে এলো।

পারিজাত, আমরা ন্যানো টেক মহাকাশযানের ভেতরে ন্যানো মানবের সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে সুদুর নক্ষত্রলোকের দিকে ছুটে যাচ্ছি। আমাদের মস্তিষ্ক ও দৃষ্টিশক্তি একই আছে। দেখা এবং বোঝা এই দু'টি ব্যাপার আমাদের কাছে খুব জরুরী।

পারিজাত দেখছে, অসীম শূন্য। সে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আমাদের শাটলের গতিবেগ কত?

আলোর গতির চল্লিশ গুণ। বুঝতেই তো পারছো, আমরা কুড়ি আলোকবর্ষ দূরত্ব কভার করবো। আমাদের সৌরমণ্ডল পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। ওই দ্যাখো, একটা সূর্য। ওটা আমাদের সূর্যের চেয়ে সাইজে ছোট হলেও গনগনে উত্তাপ বেশি। এর চারদিকে মাত্র চারটে গ্রহ পাক খায় পৃথিবীর সময়ের একুশ, আটচল্লিশ এবং অষ্টআশি দিনে।

ওদের গতি ছিলো এতটাই বেশি যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বলন্ত সূর্য পেছনে পড়ে গেল। তারই মধ্যে একটা গ্যাসিয় বায়ুমণ্ডলে আচ্ছন্ন গ্রহ সাঁ করে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

একটা ভয় পারিজাতকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। সে নিজের শরীরটাকে দেখতে পাচ্ছে না। যে মহাকাশযানে চেপে ওরা মহাশূন্যে ছুটে চলেছে, সেটাও সে দেখতে পাচ্ছে না। তার পাশে বসে থাকা ঝলকমোহন চট্টরাজকেও সে দেখতে পাচ্ছে না! তাদের শরীরের চিহ্ন নেই। মন আর দৃষ্টিশক্তিই স্বাভাবিক রয়েছে। ওর পরিচিত জগৎ, মানুষজন, গাছপাতা, ফুলপাখি, পুকুরনদী, গ্রামশহর থেকে কত কত দূরে চলে এসেছে কে জানে? যদি সে আর পৃথিবীতে ফিরতে না পারে, তা হলে কী হবে? তা হলে চিরকাল এই মহাশূন্যে ঘুরপাক খেতে হবে! জাঁনি না, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো তো? এইসব ভেবে পারিজাত ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলো।

ওরা এখন গ্রহাণুপুঞ্জ কিংবা কোনো অজানা ছায়াপথের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঝলকমোহন বললেন, আমরা অন্তত সাতখানা সূর্যমণ্ডল পেরিয়ে এসেছি। আর বেশি দেরি নেই। আর গোটা দু'তিন আলোকবর্ষ পেরোলেই পাবো আমাদের অভীষ্ট লোহিত নক্ষত্রমণ্ডল। সেখান থেকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে 581 সি গ্রহটাকে।

581 সি-র তাপমাত্রা কতটা হতে পারে স্যার?

শূন্য থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। এই তাপমাত্রা জল থাকবার প্রাথমিক শর্ত। জল যদি থাকে, ধরাই যেতে পারে, জীবন আছে। তবে গ্রহটার ভর পৃথিবীর ভরের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি। কাজেই তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও যথেষ্ট বেশি হবে। পৃথিবীর মানুষ যদি সেখানে গিয়ে পৌঁছায়, সেই মাধ্যাকর্ষণ সিস্টেমের সঙ্গে তাদের মানিয়ে নিতে বেশ কসরৎ করতে হবে।

আচ্ছা স্যার, আমাদের সূর্য সাদা। এর সঙ্গে লাল সূর্যের পার্থক্যটা কি?

আমাদের সূর্যের চেয়ে ওই লোহিত নক্ষত্র সাইজে ছোট। সূর্যের মতো তেজও নেই। প্রখরতা নেই বলেই নিষ্প্রভ লাল আলো দেয়। তবে লোহিত নক্ষত্রের আয়ু সূর্যের চেয়ে বেশি।

ওরা এগিয়ে চলেছে অসীম মহাশূন্যের পথ ধরে। ওদের সামনে পেছনে ওপরে নিচে শুধুই শূন্য। যখন কোনো নক্ষত্রের মাঝখানে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ পড়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য তখন ওদের সামনে রাত্রি নামছে। কিন্তু তা খুব অল্প সময়ের জন্য। আলোর গতির চল্লিশ গুণ বেগে চললে পৃথিবী, মঙ্গল অথবা শনির মতো সাইজের গ্রহ পেরোতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে?

অনেকক্ষণ চুপচাপ। কারো কোনো কথা নেই। এরই মধ্যে ন্যানোটেক মহাকাশযান আরো গোটা তিনেক সৌরমণ্ডল পেরিয়ে চলে এসেছে। ওদের চারপাশে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র, ধূলিকণা, উপগ্রহ ইত্যাদি সাঁ-সাঁ করে ছুটে চলে যাচ্ছে। দু-একটা পুচ্ছওয়ালা ধূমকেতুও চলে গেল ওদের সামনে দিয়ে। ওরা ছুটে চলেছে সোজা। এবার ঝলকমোহনের উত্তেজিত গলা শুনলো পারিজাত।

ওই তো আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষার লাল তারা, লোহিত নক্ষত্র! রেড ডোয়ার্ফ স্টার! পারিজাত, তৈরি থেকো। আমি যানের গতি কমাবো।

কেমন একটা হালকা ঝাঁকুনির অনুভূতি হলো পারিজাতের, সেটা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না। তবে চারপাশে তাকিয়েই সে বুঝলো, এতক্ষণ গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রগুলো যত দ্রুত তাদের পাশ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল, এখন আর তা হচ্ছে না। বিজ্ঞানী বললেন, এখন শাট্‌লের গতি আলোর গতির সমান। আমরা লোহিত নক্ষত্রমণ্ডলের বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ছি। এবার আমি যানের গতি আলোর গতির একশো ভাগের এক ভাগে

নামিয়ে আনবো। পারিজাত, তুমি ভালো করে লক্ষ করবে গ্লিসে 581- সি গ্রহের সব কিছু। বিজ্ঞানী অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, গ্রহটাকে দেখতে পাচ্ছো?

একটা গ্রহ দেখতে পাচ্ছি স্যার। কিন্তু—

কিন্তু কী?

আপনি আমাদের স্পেস্ শাট্লকে আরো সামনে নিয়ে চলুন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে!

কী সন্দেহ?

আরো একটু এগিয়ে যাই। তারপর ভালো করে দেখে বলবো।

ঠিক আছে। আমি আমার ন্যানো স্পেস শাটলকে 581' সি থেকে কুড়ি মাইল ওপরে রেখে কৃত্রিম উপগ্রহের মতো পাক খাচ্ছি। তুমি ভালো করে দ্যাখো।

স্যার, আমি জোর দিয়ে বলছি, এই গ্রহে প্রাণ থাকতে পারে না। প্রাণ নেইও।

সে কি! কেন? কিন্তু সুইজারল্যান্ডে জেনিভা অবজারভেটরিতে স্টিফেন আদ্রে ও তাঁর দলবল যে বললো—

কিন্তু আপনিই দেখুন না স্যার, 581' সি-র বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কেমন হবে বলে মনে হয়?

হুঁ। ঠিকই বলছো ছোকরা! এত গরমে জল থাকতে পারে নাকি? প্রাণ থাকবে কোত্থেকে? হতচ্ছাড়া ওই বিজ্ঞানীগুলোকে আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়তে পাঠানো দরকার। দাঁড়াও, আমি আমার ন্যানো রোবোট কাম-ক্যামরায় চোখ রাখি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বিস্ময়বিমূঢ় গলা শোনা গেল বিজ্ঞানীর।

উরিব্বাস! তাই তো! গ্রহটায় দেখছি মিথেন আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিলেমিশে গ্রিন হাউস গ্যাসের পুরু চাদর তৈরি করে রেখেছে! এই অবস্থায় গ্রহের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা একশো ডিগ্রির নিচে হবে না কিছুতেই। জল তাতে থাকবে কি করে? ওই তাপমাত্রা তো জলের স্ফুটনাঙ্ক!

সেটাই তো আমার মনে হচ্ছিলো স্যার।

কঠিন প্রশ্ন তুলছো তুমি। সাদা চোখে এটা যে তুমি বুঝতে পেরেছো, তাই অনেক।

তা হলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো স্যার?

581' সি-তে কিস্যুই দাঁড়ালো না। অনেক আশা নিয়ে এতদূর পথ ঠেঙিয়ে এলুম শুধুশুধু।

নেক্সট গ্রহটার দিকে যাবেন নাকি স্যার?

কোনটা?

গ্লিসে 581' সূর্যের চারপাশে আরো যে দুটো গ্রহ ঘুরছে, তার একটা দেখা যেতে পারে। 581' সি-র নেক্সট—

581'-ডি। খারাপ বলোনি। কাছাকাছি আবহাওয়ার গ্রহ। সূর্যটারও তেজ কম। চলো, দেখা যাক, সে কি বলে!

অদৃশ্য মহাকাশযানে বসে অদৃশ্য পারিজাত দেখলো, 581'সি গ্রহ থেকে ওরা দূরে চলে যাচ্ছে। তবে লোহিত নক্ষত্রের কক্ষের বাইরে যায়নি ওরা। যানের গতি বাড়লো। ওরা চলেছে 'গ্লিসে 581 ডি' গ্রহের দিকে।

চার

ন্যানো রোরটের ক্যামেরায় চোখ রেখে বহুক্ষণ এই নতুন গ্রহটাকে দেখলেন বিজ্ঞানী। পারিজাতও নিজের মতো করে 581'ডি গ্রহটাকে দেখছিলো। অবশ্য গুরু-শিষ্যের কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। গ্রহের চারদিকে দু'বার পাক খেয়ে নিলো ন্যানোযান। পারিজাত বললো, স্যার!

কী, বলো?

গ্রীন হাউস গ্যাস তো এই গ্রহটাকেও মুড়ে রেখেছে।

তবে এর একটা পজিটিভ সাইড আছে।

কী স্যার?

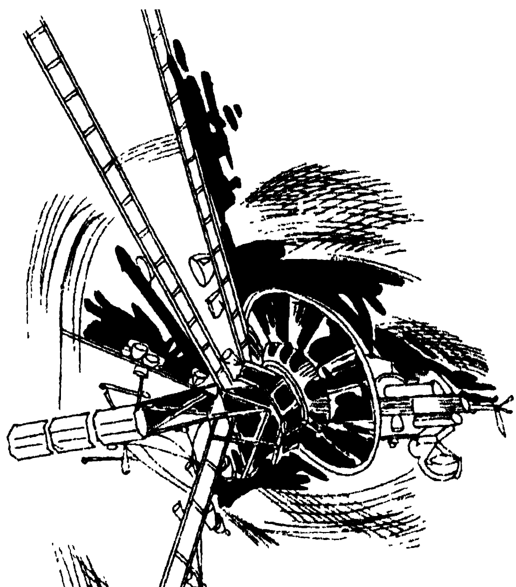
581'ডি কিন্তু হ্যাবিটেব্ল অঞ্চলের মধ্যে নেই। এমনিতে গ্লিসে 581 লোহিত নক্ষত্রের উত্তাপ আমাদের সূর্যের উত্তাপের মতো নয়। 581'ডি গ্রহ হ্যাবিটেবল জোনে না থাকায় প্রাণের উপযোগী উত্তাপ এই গ্রহে নেই এটা ঠিক কথা। কিন্তু উষ্ণতাটুকু পুষিয়ে দেবে গ্রহকে ঘিরে থাকা গ্রিন হাউস গ্যাস। এর প্রভাবে 581'ডিগ্রহের তাপমাত্রা জীবজগৎ তৈরি হবার উপযুক্ত জলবায়ু পাবে। এমনকী এই মুহূর্তেও সামান্য কিছু প্রাণের নজির প্রাথমিকভাবে এখানে পাওয়া যেতেই পারে।

তা হলে আর হলো কি স্যার? এত কষ্ট করে এত দূর নক্ষত্রজগতে এসে কোনো অজানা প্রাণীজগৎ দেখাই হলো না। আপনার প্রথম 'ন্যানো অভিযান' মাঠে মারা গেল।

আরে, মাঝে মাঝেই আমি এমন গোলমালে পড়ে যাই ওইসব স্টান্টবাজ বিজ্ঞানীগুলোর জন্য। দু'তিন মাস অন্তর অন্তর একটা করে স্টান্ট দেবে মিডিয়ার কাছে। তাই নিয়ে হুলস্থুল চলবে কয়েকদিন। পৃথিবীর লোকজন

ভাবে, এরা সব বিশাল মাপের বিজ্ঞানী। গবেষণা করে বড় কীর্তি রেখে গেলেন। আসলে এগুলো কেলোর কীর্তি ছাড়া আর কিছু নয়। চলো তো, ফিরে যাই এবার পৃথিবীতে!

সেই পুরনো পথেই ফিরে চললো অদৃশ্য পরমাণু-খণ্ডাংশ সংকুচিত দুই সওয়ারকে নিয়ে ন্যানো মহাকাশযান। দুই সওয়ারির কেউ কারোকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু কথা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে বিশাল মহাকাশকে। হাজার লক্ষ গ্রহ-নক্ষত্র আর সে সবের অজানা রহস্য সমাধানে নিয়োজিত বাঙালি মহাকাশ-বিজ্ঞানী ঝলকমোহন চট্টরাজ এভাবেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন



অজানাকে জানতে। অভিযান ব্যর্থ হলেই বা কী আসে-যায়? পরেরটা অবশ্যই সফল হবে! সদা উচ্ছল বিজ্ঞানী ও-সব নিয়ে ভাবেন না।

অপূর্ব মহাসুন্দর মহাকাশ জগৎ দেখতে দেখতে পারিজাতের খেয়াল ছিলো না। কতটা সময় পেরিয়ে এসেছে। টনক নড়লো ঝলকমোহনের কণ্ঠস্বর শুনে।

পারিজাত, রেডি হও! আমরা সৌরমণ্ডলে ঢুকছি।

সেই মৃদু মিষ্টি ঝাঁকুনির মতো। ফের শোনা গেল ঝলকমোহনের কণ্ঠস্বর। বললেন, আমরা পৃথিবীর অভিকর্ষের মধ্যে ঢুকে পড়ছি।

পারিজাত খেয়াল করেছে, বুধ আর শুক্র গ্রহ পেছনে রেখে এলো ওরা।

ওদের রোজকার চেনা সূর্য এখন সবসময়ই দেখা যাচ্ছে। ঝলমোহন সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই দেখো আমাদের চাঁদ! ওই যে আমাদের পৃথিবী!

পৃথিবীকে দেখে পারিজাতের বুকে বল এলো যেন। কিন্তু এখনো তো কেউ কারোর নিজের শরীরটা দেখতে পাচ্ছে না! যদি আগের চেহারায় ফিরে না যাওয়া যায়? তা হলে সর্বনাশ! ঝলকমোহন বললেন, এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে ন্যানো চ্যানেলের মধ্য দিয়ে আমাদের যান আমার ন্যানোটেক ল্যাবে ঢুকে পড়বে। চোখের পলক পড়ারও কম সময়ের জন্য অন্ধকার পাবো।

তাই-ই হলো। ভগ্নাংশ নিমেষের অন্ধকারের পর পারিজাত দেখলো, সেই ঘরে সাদা ধোঁয়ার আস্তরণ পাক খেয়ে চলেছে। সেই স্বচ্ছ চেয়ার দুটোতেই বসে রয়েছে ওরা দু'জন। পারিজাত বুঝতে পারছিলো, অনুভব করছিলো তার শরীরের স্বাভাবিক উপস্থিতি। বিজ্ঞানী বললেন, উঠে পড়ো।

ওরা ওই ধুম্রজাল আচ্ছন্ন ঘর থেকে বেরোনো মাত্রই শোঁ-শোঁ শব্দে হাঁ করা দেওয়াল জুড়ে গেল। এবার ওরা চলে এলো কমলা রঙের আলোয় মাখামাখি সেই ল্যাবরেটরিতে। বিজ্ঞানী দেওয়ালে হাত রাখলেন। দেওয়াল সরলো। ওরা ল্যাব থেকে বেরলো। ওমনি সাঁ করে দেওয়াল জুড়ে গেল। এবার সেই সিঁড়ি চললো। অদ্ভুত লাল রঙের আলোর সিঁড়িপথ পেরিয়ে দু'জন চলে এলো খোলা চত্বরটায়। ততক্ষণে বিজ্ঞানী সুইচ টিপে কাঠের পাটাতনটা ফেলে দিয়েছেন। এই অলিন্দ, সেই দরজা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত দু'জনে চলে এলো বাড়ির বারান্দায়। বিজ্ঞানী সোফায় বসলেন। টেবিলের উল্টোদিকে চেয়ারে বসলো পারিজাত। বিজ্ঞানী বললেন, আর কারোর কথায় ভরসা করে ফালতু টাইম নষ্ট করবো না। নিজেই ল্যাবরেটরিতে 'ন্যানোচিপ' তৈরি করে সম্ভাবনাময় গ্রহগুলোতে রেখে আসবো। আমার ন্যানোচিপই সেখানে অ্যামিনো অ্যাসিড খুঁজে বার করবে।

অ্যামিনো অ্যাসিড কেন?

অ্যামিনো অ্যাসিডই জীবনের ভিত্তি। এই কথা বলেই ঝলকমোহন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গলায় হাঁক পাড়লেন, লুল্লুরাম!

লুল্লুরাম তড়িঘড়ি ছুটে এলো।

আজ বিকেলে কি বানিয়েছিস?

আলুর পরোটা আর চাটনি।

জলদি লে আও! আর কফি।

পারিজাত তখনও শুধু ভেবেই চলেছে, স্যারের ওই ধুম্রজালময় ঘরটা কি ল্যাব? নাকি আদ্যন্ত ঐন্দ্রজালিক!

অপারেশন ২০৯৮ এক্স

২০৯৮ সালের অক্টোবর মাস। গত বছরের তুলনায় স্বাভাবিক গরম এবার অনেকটাই বেশি। যদিও গত দশ বছরে পৃথিবীর ওজোন স্তরের ফুটোগুলো মেরামত করে গ্রিন হাউস এফেক্ট কার্যত রোখা গেছে। কিন্তু এই বছরটায়



দেখা যাচ্ছে, এপ্রিল-মে মাসে তাপমাত্রা অনেকটাই বেশি। বিজ্ঞানীরা এর কারণ অনুসন্ধানে নেমেছেন। না নেমে উপায় ছিলো না। পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরবনের

একটি ব-দ্বীপে অবস্থিত বিজ্ঞান গবেষণাগার থেকে এই তাপমাত্রা মোকাবিলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
'জগদীশ সি বোস সায়েন্স সেন্টার।' ঘন অরণ্য পরিবেষ্টিত এই বিশাল বিজ্ঞান কেন্দ্রে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের পরিবেশের স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখতে নিরন্তর গবেষণা কাজ এবং তার প্রয়োগ চলেছে।

কৃত্রিম মেঘ এবং বৃষ্টি সঞ্চারের ওপর যে দিকপাল বিজ্ঞানী অসাধারণ কাজ করে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের তাপাঙ্ককে সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিকতায় নিয়ে এসেছেন, তাঁর নাম বাৎসায়ন চ্যাটার্জি। এ-বিষয়ে আর একজন দিকপাল, বাৎসায়নেরই ভাবশিষ্যা হলেন নন্দিতা ভুটিয়া। সিকিমের গেজিং-এ নন্দিতার জন্ম। মহাকাশ গবেষিকা হিসাবে ছাঙ্গু মানমন্দিরে নন্দিতা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। চীন-ভারত যৌথ সহযোগিতায় হিমালয়ের বুকে ১৩৮৬৭ ফুট উঁচুতে এই মানমন্দিরটি তৈরি হয়েছে। নাম 'ভানুভক্ত মহাকাশ চর্চা কেন্দ্র।'

ভানুভক্ত মহাকাশ চর্চা কেন্দ্রের অর্ধবলয়াকৃতি বিশাল বাড়ির পাশেই ছাঙ্গু লেক। আজ ছাঙ্গু লেকে বরফ জমেনি। আশপাশের পাহাড়গুলোও শুকনো। কখনো কখনো হালকা সাদা-কালো মেঘ লেকের জলের ওপর দিয়ে ভেসে গিয়ে মানমন্দিরটিকে বেড় দিয়ে ধরছে। নন্দিতাদেবী ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছাঙ্গু লেকের ওপর ভাসমান মেঘগুলো দেখছিলেন। এখানে এই মুহূর্তের তাপমাত্রা ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সূর্য পশ্চিমে ঢলে গেছে বহুক্ষণ। অন্ধকার হয়ে আসছে। আকাশে তারামণ্ডল এক এক করে ক্রমশ নজরে আসছে। নন্দিতাদেবী ঘড়ি দেখলেন। ৭টা বেজে ৩৫ মিনিট। এবার তিনি ছাদে যাবেন। এখানে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে দূরবীনের সামনে বসবেন। গেরুয়া রঙের সালোয়ার কামিজ পরনে, মাথায় চুলের ঢল, পিঠ ছাড়িয়ে কোমরেরও নিচে নেমে গেছে। ব্যালকনির নিয়ন্ত্রিত হলুদ আলোয় নন্দিতা ভুটিয়াকে দারুণ সুন্দর, অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী বলে মনে হচ্ছে। ধীর পায়ে হেঁটে তিনি ব্যালকনির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। এখানে গাঢ় নীল রঙের মিশ্রিত ধাতুর একটা দরজা। নন্দিতাদেবী দরজার সামনে দাঁড়ানোমাত্রই সেটার মাথায় একটা বেগুনি আলো দপদপ করে জ্বলতে শুরু করলো। নন্দিতাদেবী ডান হাতটা সামান্য তুললেন। হাতের ছায়া নীল দরজার একটা গাঢ় কালো দাগের ওপর পড়ামাত্রই বেগুনী আলো নিভে সবুজ আলো জ্বললো। এবং একটা মিষ্টি টুংটাং আওয়াজ করে দরজা খুলে গেলো। ভেতরে আলোকময় চলন্ত সিঁড়ি। নন্দিতাদেবী এগিয়ে সিঁড়িতে পা রাখামাত্রই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। পঞ্চাশ সেকেন্ডের মাথায়

তিনি ছ'তলা বাড়ির সমান উঁচু এই মানমন্দিরের ছাদের দক্ষিণ দিকের অংশে চলে এলেন। ছাদে বিশাল একটি পুরনো আমলের ২৬০ দূরবীন বসানো আছে। নন্দিতা ভুটিয়ার পরিচালনায় ৪০ জন বিজ্ঞানী এখানে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।



ছাদে চাঁদের কারখানায় তৈরি ধাতুর শিটের ছাউনি দেওয়া পিগমিদের বাসস্থান ইগলুর মতো দেখতে তিনটি বড় ঘর। এগুলোকে বলা হয় ইগলুঘর। তাপ নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে ঘরগুলিতে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়।

কাচের দরজা ঠেলে নন্দিতা দেবী সেই ঘরে এলেন। কর্মব্যস্ত রিসার্চ সেন্টারে একটানা গুঞ্জন। বহু লোক কাজ করছেন। নন্দিতাদেবী ফের বাইরে এসে দূরবীনের কাছে বসলেন। দূরবীনের নলে চোখে লাগানো মাত্রই সৌরলোক নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকালোক, গ্রহাণুপুঞ্জ যেন তাঁর হাতের মুঠোয় চলে এলো। তিনি ডান হাতে দূরবীনটা অপারেট করতে করতে দিক পরিবর্তন করে মহাকাশ পর্যবেক্ষণে ডুবে গেলেন। মহাকাশের বিশালত্ব রোজকার ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতাকে ভুলিয়ে দেয়। লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরে নক্ষত্রপুঞ্জকে জানা, মহাকাশলোকের সীমাহীন রহস্যের খোঁজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার মধ্যে কি যে আনন্দ আছে তা বিজ্ঞানীমাত্রই জানেন। নতুন একটা নক্ষত্র আবিষ্কৃত হলে সারা বিশ্বে তাই বিজ্ঞানীমহলে হই-চই পড়ে যায়।

এখন নন্দিতাদেবীর চোখ দূরবীনে। সব ঠিকঠাকই চলছে। ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, প্লুটো, গ্রহাণুপুঞ্জ, অথবা আমাদের নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেনটোরি প্রত্যেকেই তাদের নিজের কক্ষে নিজস্ব গতিতেই চলেছে। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু স্বাভাবিক পরিবর্তন থাকেই। সেগুলিও নন্দিতাদেবীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারছে না। কারণ অভিজ্ঞ এই মহাকাশবিজ্ঞানীর চোখ এবং মস্তিষ্ক যেন রীতিমতো এক উন্নতমানের কম্পিউটার।

কিন্তু একি! নতুন কি একটা যেন দেখা গেলো! নন্দিতা ভুটিয়া দূরবীন থেকে চোখ সরিয়ে সালোয়ারের ওড়না দিয়ে চোখটা ভালো করে মুছে নিলেন। ফের চোখ রাখলেন দূরবীনের নলে। কি আশ্চর্য! কলমের মতো ছোট্ট একটা আলোকবস্তু তির তির করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে যেন ওটা পৃথিবীর দিকেই এগিয়ে আসছে। একেবারে নতুন জিনিস! নন্দিতাদেবী মনে মনে বললেন, সবাইকে দেখাতে হবে। হয় উল্কাপিণ্ড, নয়তো ধূমকেতু, অথবা গ্রহাণু—এই তিনটির যে কোন একটি অবশ্যই এটা। নন্দিতাদেবী তাঁর হাতঘড়ির একটা ছোট বোতাম টিপে কথা বললেন।

মিস্টার রণধীর সুব্বা কি কম্পিউটার টেবিলে আছেন?

তাঁর হাতঘড়ির মধ্যেই ছোট একটি স্পিকারে জবাব এলো, ইয়েস ম্যাডাম, খবর কী?

এখানে চলে আসুন দূরবীনকে নর্থ-ইস্ট অ্যাঙ্গেলে রাখলে গ্যাস্প্রা আর ইডা—এই দুটো গ্রহাণুপথের মাঝখানে কলমের মতো একটা আলোকবস্তু দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওটার গতিপথ পৃথিবীমুখি।

রণধীর সুব্বা দূরবীনে চোখ রেখে আলোকবস্তুটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন, ম্যাডাম ঠিকই বলেছেন। ওটার গতিপথ পৃথিবীমুখী।

বলেই সুব্বা ফের চোখ রাখলেন দূরবীনে। বিশ সেকেন্ড বাদে দূরবীন থেকে চোখ নামিয়ে তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলেন। বললেন, নন্দিতাদেবী, যদি অনুমতি দেন তো, স্টিরিওস্কোপিক মাইক্রোস্কোপে এটা দেখার চেষ্টা করি।

চলুন!

ওরা দু'জন ছুটলেন। যদি এঁদের ধারণা সঠিক হয়, বিশ্বের সামনে দারুণ বিপদ! সাঙ্ঘাতিক!

যেতে যেতেই নন্দিতা দেবী বললেন, ওটা যদি কোন গ্রহাণু হয়, আর তা যদি আমাদের পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতে থাকে, তা হলে সমুহ বিপদ মিস্টার সুব্বা।

হ্যাঁ। আপনার মনে আছে কি না জানি না, গত শতকের' ৯৬ সালে ইউ এস এ-র অ্যারিজোনা অবজারভেটরিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী টিমোথি স্পার এরকম একটি গ্রহাণু হঠাৎই দেখে ফেলেছিলেন। ওটাও পৃথিবীর দিকে আসছিলো। মহাকাশ দূরত্বের সামান্য তফাৎ দিয়ে ওটা বেরিয়ে যায়।

হ্যাঁ। ওটা নিয়ে আমি গবেষণাও করেছি। পৃথিবী থেকে মাত্র ৪৫০.৬২০ কিলোমিটার দূর দিয়ে ওটা বেরিয়ে গিয়েছিলো।

মানমন্দিরের ছাদের পশ্চিমাংশে চলে এলেন ওরা দু'জন। এখানে রাখা আছে স্টিরিওস্কোপিক মাইক্রোস্কোপ। এটি দিয়ে মহাকাশের বুকে ঘুরে বেড়ানো ক্ষুদ্র জিনিসগুলিকে দেখা হয়। অসম্ভব শক্তিশালী এই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দুই বিজ্ঞানী ধেয়ে আসা সেই কলম-বিন্দু সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এলেন!

হ্যাঁ। এটা একটা গ্রহাণুই বটে। কোন ভুল নেই।

আর এটা যদি সত্যি পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে, অথবা বিস্ফোরিত হয়, তবে ৪০০০ থেকে ১৫০০০ মেগাটন এনার্জি উৎপাদন করবে। সারা বিশ্বের সঞ্চিত পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার মিলিত বিস্ফোরণ ক্ষমতার চেয়েও যা কয়েকগুণ বেশি।

সর্বনাশ! পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে যাবে!

হ্যাঁ। মানুষের অস্তিত্ব আর থাকবে না—বলতে বলতে নন্দিতা দেবীর ফর্সা মুখখানা উত্তেজনায় লাল টকটকে হয়ে গেলো।

দুই

বে অব বেঙ্গলের কোলে সুন্দরবনের ঘন অরণ্যছায়া বেষ্টিত জগদীশ সি বোস সায়েন্স সেন্টারে বিশ্বখ্যাত পরিবেশবিদ ডক্টর বাৎসায়ন চ্যাটার্জি সারাদিনের কাজকর্মের শেষে সন্ধ্যার পরে তাঁর স্টাডিরুমে সবে এসে বসেছেন। তখনই তাঁর টেবিলের কম্পিউটার স্ক্রিনে তাঁর প্রিয় ছাত্রী নন্দিতা ভুটিয়ার সুন্দর মুখটি ভেসে উঠলো। বাৎসায়ন চ্যাটার্জি তাঁর হাতঘড়ির বোতাম টিপলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো নন্দিতা! কী ব্যাপার?

স্যার, আজ এইমাত্র আকাশে আমরা একটা গ্রহাণু দেখলাম। একেবারে নতুন। বিপদের কথা হলো, ওটা পৃথিবীর দিকেই ছুটে আসছে।

তাই নাকি! আকাশের কোন দিকে আছে ওটা?

ছাঙ্গু থেকে স্টিরিওস্কোপিক মাইক্রোস্কোপে নর্থ-ইস্ট অ্যাঙ্গেলে গ্যাস্প্রা এবং ইডা গ্রহাণুপথের মাঝখানে। আমাদের ফোটোগ্রাফিক ক্যামেরা-দূরবীন কাজ করছে না। না হলে ওটার ছবি তুলে আমি আপনাকে এক্ষুনি দেখিয়ে দিতে পারতাম।

বাৎসায়ন চ্যাটার্জি কম্পিউটার স্ক্রিনে নন্দিতার অস্বস্তিভরা মুখ দেখে বললেন, ডোন্ট গেট নার্ভাস নন্দিতা। গ্রহাণু প্রতিরোধের প্রযুক্তি আমরা কিছুদিন হলো আয়ত্ত করেছি। ভাববার কিছু নেই। তবে দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। আমি এই মুহূর্তে মানমন্দির আর অবজারভেটরিগুলোতে খবর পাঠাচ্ছি।

কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে নন্দিতার ছবি মিলিয়ে যেতেই ডক্টর বাৎসায়ন উঠে পড়লেন দ্রুত। স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে করিডর ধরে চলে এলেন সায়েন্স সেন্টারে কমিউনিকেশন বিভাগে। বিশ্বব্যাপ্ত বিভিন্ন মানমন্দির, বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, অবজারভেটরি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং সমুদ্রতল ও মহাকাশের বুকে উপগ্রহ-বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রগুলির সঙ্গে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। নিখুঁত এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় পৃথিবীর যে কোন জায়গার সঙ্গে যখন তখন কথা বলা শুধু নয়, প্রয়োজন তথ্য ও ছবির আদানপ্রদান করা যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। সাঁইত্রিশজন দক্ষ কর্মী এখানে কাজ করেন। যাঁরা তথ্য, যোগাযোগ, র‍্যাডার এবং কম্পিউটার গুলে খেয়ে এসেছেন। ডক্টর বাৎসায়ন কমিউনিকেশন বিভাগের মূল কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুবকটির কাছে গেলেন।

হ্যালো কামরাজ, এই মুহূর্তে জরুরী কাজ কাছে একটা। এক্ষুণি নাসা,

শ্রীহরিকোটা, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি এবং ইউ এস এর ক্যালিফোর্নিয়ার স্পেসওয়াচ সেন্টারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করো।

ঠিক আছে স্যার। আমি যোগাযোগ করছি। কিন্তু কি ব্যাপার?

ওঁদের বলো, ভারত থেকে নর্থ-ইস্ট অ্যাঙ্গেলে গ্যাস্প্রা এবং ইডা গ্রহাণুপথের মাঝখানে একটা কলমের মতো ছোট্ট গ্রহাণু অথবা ধূমকেতুর মতো জিনিস দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওটার গতি পৃথিবীমুখী। ওদের হাতে সি-সি-ডি-র আপ-টু-ডেট পদ্ধতির দূরবীন আছে। ওরা সেটা দিয়ে দ্রুত ছবি তুলে যেন আধঘণ্টার মধ্যেই তা পাঠিয়ে দেয়।

ও কে স্যার।

এই মুহূর্তে এই বিষয়টাই গুরুত্ব পাবে। আমি তিনজনের টিম করে দিচ্ছি। তুমি, চন্দ্রশেখরণ এবং অবধূত যাদব—এই তিনজন জরুরী ভিত্তিতে সমস্ত স্পেস রিসার্চ সেন্টার ও স্পেস ওয়াচ সেন্টারের সঙ্গে হোল টাইম যোগাযোগের ব্যবস্থা করে ফেল। প্রতি মিনিটে খবর চাই। ঘটনা সত্যি হলে ফারদার ডেভলপমেন্ট যা হবে, আমার কাছে তা পৌঁছে দেবে।

ইয়েস স্যার।

বাৎসায়ন চ্যাটার্জি সমস্তরকম নির্দেশ দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। তথ্য ও খবর সংগ্রাহক সমস্ত কম্পিউটার সিস্টেম চালু করে দিলেন। এদিকে দশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে দ্রুত ধাবমান প্রেরকযন্ত্রের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ১৪২টি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে নতুন গ্রহাণুর খবর পাঠিয়ে দিলেন কামরাজ, চন্দ্রশেখরণ এবং অবধূত যাদব। সম্ভাব্য বিপদবার্তাটুকু জানাতেও তাঁরা ভুললেন না।

বিজ্ঞানী মহলে খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। অ্যারিজোনা এবং নাসা থেকে শুরু করে ভারতের শ্রীহরিকোটা, উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল অবজারভেটরিগুলোয় সাজো সাজো রব পড়ে গেলো। বিশাল বিশাল এবং শক্তিশালী দূরবীনের পাল্লার মধ্যে অচিরেই সেই অজানা কলমের মতো আলোকবিন্দু ধরা পড়ে গেলো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বললেন, এটা গ্রহাণুই। সম্ভবত কুইপার গ্রহাণুপুঞ্জ (কুইপার বেল্ট) থেকেই এটি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। নন্দিতা ভুটিয়ার অনুমান সত্যি হলো। ডক্টর বাৎসায়ন নতুন গ্রহাণুর উপগ্রহ প্রেরিত ছবির কপির পেয়ে গেলেন এক ঘণ্টার মধ্যেই। তিনি তা ফের ফোটো করে ছাঙ্গু মানমন্দিরে তাঁর ছাত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বিশ্বজোড়া তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো। মহাকাশ প্রযুক্তিতে উন্নত

দেশগুলির রাষ্ট্রনায়করা—বিশেষ করে রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, ব্রিটেন, চীন, জার্মানি, ভারত ও ইতালির মহাকাশবিদরা টেলি-অডিও-ভিসুয়াল সিস্টেমের সাহায্যে এ ব্যাপারে কি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। সতীর্থ বিজ্ঞানী লুইস আব্রাহাম বোনাপার্ট প্যারিস থেকে ডক্টর বাৎসায়নকে ফোন করলেন সেদিনই রাত ১২টা নাগাদ। বাৎসায়নের টেবিলের কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা গেলো আব্রাহাম বোনাপার্টের ছবি। ডক্টর বাৎসায়ন তাঁর হাতঘড়িতে বোতাম টেপামাত্রই প্যারিসে আব্রাহামের রিসার্চ রুমে কম্পিউটার স্ক্রিনে বাৎসায়নের ছবি এসে গেলো। দু'জনে শুরু করলেন গ্রহাণু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা।

হ্যালো ডক্টর চ্যাটার্জি, তুমি নাকি এই নতুন গ্রহাণু প্রথম দেখেছো?

না। সিকিমে ছাঙ্গু মানমন্দিরে আমার ছাত্রী নন্দিতা এটা প্রথম দেখে।

ওহ ডেঞ্জারাস। আমি সি-সি-ডি দূরবীনে ওটা দেখলাম। ওর চলার গতি সৌরমণ্ডল বরাবর। চলার সূচীমুখ অবশ্যই পৃথিবীর দিকে।

আপনি কি ভাবছেন আব্রাহাম? অতীতের গ্রহাণুপাত সম্পর্কিত কম্পিউটার-ভিডিও রেকর্ডগুলো দেখেছেন? আমি এইমাত্র ডেটা লাইব্রেরিতে গ্রহাণু-বিস্ফোরণ বিষয়ের ফাইলগুলো দেখছিলাম। অ্যারিজোনায় 'মেটিওর কেটার' গ্রহাণু পতনের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?

হ্যাঁ চ্যাটার্জি। ওটা ৫০ হাজার বছর আগের ঘটনা। ৩০ মিটার ব্যাসের ওই গ্রহাণু আছড়ে পড়ে ছিলো। তাতে ১.২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের পুরো জায়গাটাই গহ্বর হয়ে গিয়েছিলো।

হ্যাঁ। আর যেটা দেখলাম, সেটা তো ১৯০৮ সালের ঘটনা। ৬০ মিটার ব্যাসের গ্রহাণুটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকেই বিস্ফোরিত হয়।

এগজ্যাক্টলি। তবে তখন আমরা ছিলাম অসহায়। এখন আলোর গতিসম্পন্ন সৌরপালের সাহায্যে পরমাণু বোমা দিয়ে সৌরলোকের বহুদূরেই ওটাকে ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে।

কিংবা গতিপথ পালটে দেওয়া যেতে পারে।

ঠিকই বলেছো। আজ থেকে ১৩০ বছর আগে পাইওনিয়ার ১০ কে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিলো, যা কুড়ি বছরে মাত্র পাঁচ লক্ষ কোটি মাইল যেতে পেরেছিলো। তখনকার বিজ্ঞানপ্রযুক্তি মহাকাশযানকে এর চেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন করতে পারেনি।

কিন্তু জাপান তো এখন তাদের মহাকাশযানের গতি আলোর গতির সমান

জায়গায় নিয়ে গেছে। ওরা আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র আলফা সেনটোরিতে লেসার যান পাঠিয়েছে। কাজেই আমি মনে করি, লেসার যানের সাহায্যে পরমাণু বোমা নিয়ে মহাকাশে এই গ্রহাণুটিকে তার বর্তমান অবস্থানের কাছেপিঠেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করে অথবা গতিপথ বদলে দেওয়া যেতে



পারে। এখন শুধু বড় দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের সিদ্ধান্তটাই প্রয়োজন। এবং তা খুব তাড়াতাড়ি দরকার। কারণ পৃথিবীর দিকে এই গ্রহাণুটি ঘন্টায় ১০৮, ৫০০ কিলোমিটার বেগে হু-হু করে ছুটে আসছে।

সেজন্যই আমি তোমাকে টেলিফোন করলাম। নাসা আমার সঙ্গে যোগাযোগ

করেছিলো। আমি ওটাকে তাড়াতাড়ি ধ্বংস করার পক্ষেই মত দিয়েছি। তুমি কী বলো?

ভারতে এই মুহূর্তে তাপমাত্রা অত্যাধিক বেশি। আমাকে প্রতিদিনই কৃত্রিম মেঘ ও বৃষ্টি সঞ্চার করে তাপাঙ্ক নির্দিষ্ট মাপে রাখতে হচ্ছে। আমি চাই, বৃহস্পতির কাছাকাছি আসার আগেই ওটার কিছু একটা ব্যবস্থা করা হোক। না হলে ফের ওজোন স্তরে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেবে।

থ্যাঙ্ক ইউ। ফের কথা হবে। এখন প্যারিসে রাত্রি সাড়ে বারোটা বাজে। ভারতে এখন ভোর সাড়ে তিনটে।

এখন ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলে নিউজ হবে। খবর শুনবো। তুমি টি ভি চালিয়ে খবরটা শুনে নাও।

টেলি-ভিডিও-র কানেকশন অফ করে ডক্টর বাৎসায়ন টি ভি চালালেন। খবর হবে এক্ষুনিই।

আজকের খবরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, খেলাধূলা এসব তেমন গুরুত্ব পেলো না। খবরের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই কলমাকৃতির ছুটে আসা গ্রহাণুর কথা। পৃথিবী থেকে পাঠানো যে ক'টি উপগ্রহ নেপচুনের চারদিকে ঘুরছে, তারা সরাসরি নব্য আবিষ্কৃত গ্রহাণুটির ছবি পৃথিবীর বিভিন্ন মহাকাশ গবেষণাগারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। স্যাটেলাইট-লাইভ-ফোরকাস্টে তা বিশ্বের সব মানুষ দেখতে পেলো। বাৎসায়ন দেখছিলেন রঙিন টি ভি-র পর্দায় গ্রহাণুটির চলমান ছবি। কলমের মতো দেখতে একটি লাল আলোকবস্তু। তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে ওটা ক্রমশঃ এগোচ্ছে। যেহেতু এটির নামকরণ করা হয়নি, তাই এটিকে '২০৯৮-X' নামে উল্লেখ করা হচ্ছিলো। টি ভি-র পর্দা থেকে গ্রহাণুর ছবি মিলিয়ে যেতে না যেতেই ফুটে উঠলো নন্দিতা ভুটিয়ার মুখ। সংবাদ পাঠিকা বলছিলেন, ইনি হলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষিকা নন্দিতা ভুটিয়া। ইনিই দু'হাজার আটানব্বই এক্স গ্রহাণুটি আবিষ্কার করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল স্যাটেলাইট চ্যানেল তাঁর সরাসরি ইন্টারভিউ হাজির করছে।

আচ্ছা মিস নন্দিতা, দূরবীনে এটি দেখে প্রথমে আপনার কী মনে হয়েছিলো?

আমি গ্রহাণু বা উল্কাপিন্ড বলেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এর পৃথিবীমুখি গতি দেখে আমি খানিকটা ঘাবড়ে যাই। আমি ও আমার সহকারী রণধীর সুব্বা, দুজনে মিলে স্টিরিওস্কোপিক মাইক্রোস্কোপে বহুক্ষণ দেখে গ্রহাণুটির গতিপথ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হই। তখন আমি আমার অধ্যাপক ডক্টর বাৎসায়নের

সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনিই সর্বত্র এই খবরটা পাঠিয়ে দেন।

এই মুহূর্তে পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে দু'হাজার আটানব্বই-এক্স কে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করা ছাড়া উপায় নেই—এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

এই প্রশ্নে নন্দিতা ভুটিয়াকে একটু বিষণ্ণ মনে হলো। উত্তরে বললেন, মহাকাশের ক্ষুদ্রতম কণাকে অপত্যস্নেহে লালন করি আমরা। এমন একটি নতুন গ্রহাণুর ধ্বংস চাই না আমি। তবে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের হাতে এখন লেসার বা মাইক্রোওয়েভ রয়েছে। এর সাহায্যে গ্রহাণুর গতিপথ পাল্টে দেওয়া যেতে পারে।

তা যদি ব্যর্থ হয়?

তবে আর কি করা যাবে! পরমাণু শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে।

টিভির পর্দা থেকে নন্দিতা ভুটিয়ার ছবি মিলিয়ে যেতেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক পর্দায় এলেন। সংবাদপাঠিকা এই মুহূর্তের সর্বশেষ খবর উদ্ধৃত করে বললেন, বিশ্বের রাষ্ট্রনায়করা পারস্পরিক আলোচনায় সিদ্ধান্তে এসেছেন, জাপানের উচ্চ প্রযুক্তিতে তৈরি সর্বাধুনিক গতিসম্পন্ন সৌরপালের সাহায্যে নতুন গ্রহাণুটির মোকাবিলা করা হবে! এখনই সৌরপালে চেপে বিভিন্ন গ্রহে যাচ্ছেন মহাকাশচারীরা। সূর্যরশ্মির চাপ সৌরপালযুক্ত এই যানকে সবসময়ে শক্তি যুগিয়ে যাবে। তাতেই চলবে এই যান।

এই সৌরপালযুক্ত মহাকাশযানের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বলবেন নাসার মহাকাশবিজ্ঞানী বব ক্রিস্টোফার।

সংবাদপাঠিকার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই টি ভি-র পর্দায় বব ক্রিস্টোফারের ছবি দেখা গেলো।

এদিকে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর গ্রহাণুর খবর পৌঁছে গেছে। আতঙ্ক আর ভয়ার্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে সারা বিশ্বজুড়ে। নিউইয়র্ক, সিডনি, কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, প্যারিস, প্রাগ, বেজিং, হঙকঙ, বার্লিন, রোম, পিয়ং ইয়ং, সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পৃথিবী আজ ধ্বংসের মুখে। সারা বিশ্বের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে গেছে এই খবর। কারণ, এখন পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে সংবাদ মাধ্যম পৌঁছতে পারেনি। কী হবে তাহলে? এর বিস্ফোরণে কি শুধু একটি শহর বা কোন নির্দিষ্ট এলাকা ধ্বংস হবে? নাকি সারা বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বই

বিপন্ন হয়ে পড়বে? কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে গ্রহাণু আছড়ে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। তাতেই ধ্বংস হয়ে যায় বৃহৎ প্রাণী ডায়নোসররা। তা হলে এবার কি হবে? মানুষ কি ধ্বংস হয়ে যাবে? এই সব নানা প্রশ্নে পৃথিবীর মানুষ বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। বড় বড় শহরগুলোতে পুলিস হেডকোয়ার্টার, রেডিও, টি ভি এবং হাসপাতালগুলিতে টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে লাগলো। আশঙ্কায় দুর্বলচিত্ত মানুষজন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। বহু সড়কে ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটতে লাগলো। রেডিও, টি ভি-তে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলে মানুষকে বারে বারে আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর মানুয নিজেদের ধ্বংসের আশঙ্কায় ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লো।

বিজ্ঞানীদের একটা আশঙ্কাও আছে। অ্যারিজোনা অবজারভেটরির অন্যতম প্রবীণ মানুষ পিটার বোথাম জাপানের কিয়োডো মানমন্দিরের প্রধান পৃথিবীখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী তোশিবা নাকামুচিকে টেলি-অডিওভিসুয়ালে কনট্যাক্ট করলেন।

হ্যালো তোশিবা!

হ্যালো পিটার!

জাপানি সৌরপালযুক্ত যান এত বিরাট দূরত্বে অপারেশন চালাবার মহড়া দিয়েছে কোনোদিন?

না।

তবে? যেভাবে অঙ্ক কষে পরমাণু অস্ত্র দিয়ে সৌরপাল যানকে বৃহস্পতির আকাশে পাঠানো হচ্ছে, কাজের সময় তার যদি সামান্য এদিক-ওদিক হয়, তা'হলে গ্রহাণুটিকে ঠেকানো যাবে না।

তোমার অনুমান নেহাৎই ভুল, তা আমি বলছি না। তবে 'অপারেশন দু'হাজার আটানব্বই-এক্স' কে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর করতে তিনটি সৌরপাল যান পাঠানো হচ্ছে। যানের রোবোটরা প্রথম দফায় লেসার প্রয়োগ করে গ্রহাণুর গতিপথ পাল্টে দিতে চেষ্টা করবে। সম্ভব না হলে পরমাণু বোমা ছুঁড়বে।

পিটার বোথাম তোশিবার এই কথায় কতটা নিশ্চিন্ত হলেন বোঝা গেলো না। কিন্তু সন্দেহ, অনিশ্চয়তা এবং আশঙ্কার দোলায় দুলতে লাগলেন বিজ্ঞানীমহল এবং বিশ্বের সাধারণ মানুষ। হাতে সময় নেই। আর এক ঘন্টার মধ্যে 'অপারেশন দুহাজার আটানব্বই এক্স' এর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

তিন

পনেরো মিনিট করে সময়ের তফাতে জাপানের এক সমুদ্রদ্বীপের সর্বাধুনিক রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে তিনটি সৌরপালযান আকাশে উঠলো। দুটির মধ্যে রয়েছে লেসার প্রয়োগ ব্যবস্থা। অপরটিতে পরমাণু বোমা। এই তিনটি যানের গতি এবং যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবে পৃথিবীতে অবস্থিত কন্ট্রোল রুম। উপযুক্ত সময়ে রোবোটগুলিকে সচল করা হবে। ওরা বোমা অথবা লেসার প্রয়োগ করবে। কিয়োডোতে এই কন্ট্রোলরুমে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মহাকাশবিজ্ঞানী এবং পরমাণু ও লেসার-মাইক্রোওয়েভ বিশারদের নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁরা উপগ্রহ ক্যামেরা মারফত পাঠানো তিনটি সৌরপালযানের গতিবিধি লক্ষ রাখবেন। উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন। রেডার ও কম্পিউটার স্ক্রিনে আলাদা করে তিনটি চলমান মহাকাশযানকেই দেখা যাচ্ছে।

পাশাপাশি সারা বিশ্বের ১৪২টি মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে উপগ্রহ প্রেরিত সৌরযানের চলমান ছবি ধরা হয়েছে কম্পিউটার স্ক্রিনে। বিজ্ঞানী, গবেষক ও ছাত্ররা উৎকণ্ঠা উত্তেজনা আর আগ্রহ নিয়ে যেমন লক্ষ্য রাখছেন মহাকাশযান তিনটিকে, তেমনি লক্ষ রাখছেন 'কিং অব কুইপার বেল্ট'—প্লুটো'-র এলাকা থেকে ক্রমশঃ অপসৃয়মান গ্রহাণু-কে। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ চ্যানেল এই সমস্ত ঘটনা লাইভ টেলিকাস্ট করছে। আঞ্চলিক টেলিভিশনগুলিও তাদের নিজস্ব উপগ্রহ মারফত সমস্ত ঘটনাই টেলিভিশন স্ক্রিনে হাজির করেছে। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের চোখ টিভি-র পর্দার দিকে।

ইন্টারন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলের মহিলা ধারাভাষ্যকার তাঁর উত্তেজনা চাপা দিয়ে রাখতে পারছিলেন না। টিভি-র পর্দা জুড়ে মাঝে মাঝেই অসীম মহাকাশ এবং সেই ছোট্ট গ্রহাণুটিকে দেখা যাচ্ছিলো। নাসার মহাকাশবিজ্ঞানী বব ক্রিস্টোফার 'অপারেশন ২০৯৮-x'-এর বিশ্লেষণ করবেন। ধীর-স্থির সংযত মানুষটিকে পর্দা জুড়ে দেখা গেল। বব বলছিলেন পৃথিবীর সমস্ত নারীপুরুষকে; একবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে পৃথিবী আজ যে সমস্যার মুখে পড়েছে, তা অনায়াসেই সমাধান করা যাবে। আপনারা অনর্থক ভয় পাবেন না। বব বলছিলেন—

আপনারা জানেন, আজ থেকে শতবর্ষ আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে প্লুটো কোনো গ্রহ নয়। এর আবিষ্কারক ক্লাইভ টম্বো বলেছিলেন, প্লুটো হচ্ছে 'দ্য

কিং অব দ্য কুইপারস বেল্ট'। এটি একটি ধূমকেতু। নেপচুনের আবহমণ্ডলসীমান্তের পরে সৌরজগতের শেষ সীমায় এসে একটি ধূমকেতুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়েছে গত শতকেই। ১৯৫১ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেরার্ড কুইপার এই ধূমকেতুপুঞ্জের সন্ধান পান। এর মূল ধূমকেতুটিই হলো প্লুটো। এই কুইপার পুঞ্জ থেকেই সম্ভবত গ্রহাণুটি যে কোন কারণেই হোক খসে পড়েছে এবং সৌরজগৎ বরাবর ছুটতে আরম্ভ করেছে। বর্তমানে এই গ্রহাণুর গতি ঘন্টায় ১০৮,৫০০ কিলোমিটার। এর ব্যাসও জানা গেছে। ১৫ মিটারের গুণিতক। এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও এর সাঙ্ঘাতিক গতিই দারুণ বিস্ফোরণ থেকে অবর্ণনীয় শক্তির সঞ্চার করে পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিতে পারে। তবে পৃথিবীর মানুষ লেসার বা মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তিকে অসামান্য জায়গায় নিয়ে গেছে। তাই কোন ভয় নেই।

টি ভি-র পর্দা থেকে ক্রিস্টোফারের ছবি চলে যেতেই সংবাদ পাঠিকা রেবেকা ম্যান্ডেলাকে আবার দেখা গেল। ফের দেখা গেলো উপগ্রহ প্রেরিত গ্রহাণু-'২০৯৮-X'-এর ছবি, আর একদিকে তিনটি ইনসেটে এগিয়ে চলা তিনটি মহাকাশ যানের ছবি। প্লুটোর আকর্ষণসীমা পেরিয়ে ছুটে আসছিলো গ্রহাণুটি। ইউরেনাসের ডান পাশ দিয়ে ওটা যাবে। সংবাদপাঠিকা বলছিলেন, পৃথিবীর অভিকর্ষ এলাকা পার হলেই সৌরপাল যানটি প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি চলে যাবে। আলোর গতি সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল। মহাশূন্যে প্রতি সেকেন্ডে তা দাঁড়ায় ১৮৭০০০ মাইল। আইনস্টাইন বলেছিলেন, মহাশূন্যে কোন বস্তুর গতি যদি আলোর গতির অর্ধেক হয়, তবে ওই বস্তুটি ভারী মনে হবে। তার গতিও কমে আসতে থাকবে। তাই এই যানে সূর্যরশ্মি ক্রমশ সৌরপালে চাপ সৃষ্টি করে গতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

উত্তেজনায় বাক-রহিত পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যখন টিভি-র পর্দার দিকে,তখন ছাঙ্গু মানমন্দিরে তাঁর চল্লিশজন সহকারী নিয়ে নন্দিতা ভুটিয়া স্টিরিওস্কোপিক মাইক্রোস্কোপে গভীর মনোযোগের সঙ্গে 'দুহাজার আটানব্বই-এক্স' গ্রহাণুটি লক্ষ করে যাচ্ছিলেন। এখানকার ২৬০'' দূরবীনের সাহায্যে গ্রহাণুটিকে নজরে রাখছিলেন রণধীর সুব্বা এবং পবন গুরুং। আর একদল বিজ্ঞানী সোহম ড্যাংজম্পার নেতৃত্বে টিভি-র সামনে বসে মহাকাশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বুঝে নিচ্ছিলেন। তিন দফায় একটি সুসম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছিলো। ওদিকে সুন্দরবনে ডক্টর বাৎসায়ন তখন জগদীশ সি বোস সায়েন্স সেন্টারের সামনের চত্বরের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের শঙ্কর প্রজাতির গাছ তিনি উদ্ভাবন করেছেন। সেইসব গাছের নিবিড়

সবুজত্বের নিচে দাঁড়িয়ে এই পক্ককেশ বর্ষীয়ান পরিবেশ-বিজ্ঞানী পৃথিবীতে আরো সুস্থতা এবং সৌন্দর্যময়তা কী করে আনা যায় তাই ভাবছিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত পুরোপুরি, বর্তমান প্রযুক্তি এই গ্রহাণু সমস্যার সমাধান করে ফেলবে।

পৃথিবীর মানুষ যে যেই গোলার্ধে, রাতে অথবা দিনে, ভোরে অথবা



অপরাহ্ণেই থাকুন না কেন, সময় আর তাঁদের ফুরোচ্ছিলো না। তবুও নিত্য আশঙ্কা নিয়ে মানুষ কাটিয়ে দিলো সাত-সাতটি দিন। উপগ্রহ-ক্যামেরা ছবি পাঠিয়ে যাচ্ছে এবং খবরও দিয়ে যাচ্ছে, কোনরকম বাধা ছাড়াই তিনটি সৌরপাল যান মঙ্গলের অভিকর্ষ সীমান্ত অতিক্রম করেছে। 'দু' হাজার আটানব্বই এক্স' গ্রহাণু ইউরেনাসের অভিকর্ষ অঞ্চল পেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে। শনির চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় বলয় থেকে ৮৮০৯৫০ কিলোমিটার দূর দিয়ে এটা যাবে। সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির অভিকর্ষের বাইরেই এর বুকে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে।

চার

২০৯৮ সালের ২৮শে অক্টোবর। আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৪৫ মিনিট সময়কালের মধ্যে 'অপারেশন দু'হাজার আটানব্বই-এক্স'-এর সমাপ্তি ঘটবে। হয় মরণ, নয় বাঁচন। অবশ্য ভোর রাতে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ স্যাটেলাইট চ্যানেল খবর দিয়েছিলো, পৃথিবীর অভিকর্ষ সীমার বাইরে দ্বিতীয় দফায় একে প্রতিরোধ করার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে। যদিও দুই দেশ ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে নারাজ।

ভারতে সূর্য অস্ত গেছে। ফ্রান্সে এখন দুপুর। আমেরিকায় এখন ভোরবেলা। মহাকাশের কোনো দিনরাত্রি নেই। শনিগ্রহের বলয় থেকে কাঙ্ক্ষিত দূরত্ব বজায় রেখেই সম্ভবত গ্রহাণুটি পৃথিবীর দিকে এগোচ্ছিলো। ছাঙ্গুতে ভানুভক্ত মহাকাশ চর্চাকেন্দ্রে অর্ধবলয়াকৃতি বিশাল বাড়িটির মাথায় দিন ও রাতের এই সন্ধিলগ্নে নন্দিতা ভুটিয়া টেলিস্কোপিক মাইক্রোস্কোপে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে হলো, গ্রহাণুটির তির তির করে কাঁপুনির মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তিনি আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এদিকে চরম সময় প্রায় হয়ে এলো। ভারতীয় সময়ে এখন সন্ধ্যা ৫ টা ৫৮ মিনিট ৪০ সেকেন্ড। বৃহস্পতির অভিকর্ষ সীমার বাইরে গ্রহাণুটির মুখোমুখি হচ্ছে প্রথম সৌরপাল মহাকাশযানটি। কোটি কোটি মানুষ উৎকণ্ঠা চেপে রেখে টি ভি-র পর্দায় চোখ রেখেছে। কী হবে শেষ পর্যন্ত!

নন্দিতাদেবীর কপালে ভাঁজ পড়লো। গ্রহাণুটির গতির হেরফের ঘটেছে। তিনি রণধীর সুব্বাকে ডেকে পাঠালেন। হাতে কোনো সময় নেই। কিছু একটা করতে হবে। এদিকে বৃহস্পতির অভিকর্ষ সীমার বাইরে মহাকাশযানের রোবোট প্রথম লেসার মাইক্রোওয়েভ রশ্মি ফোকাস করেছে। পৃথিবীর মানুষের দুরু দুরু বুক—বিজ্ঞানীদের গভীর দুশ্চিন্তা—রাষ্ট্রনায়কদের দায়িত্ববোধের পরীক্ষা। কী হবে?

কিন্তু না! লেসার ফোকাস লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে! 'দুহাজার আটানব্বই-এক্স'-কে উপগ্রহ ক্যামেরা ধরেই রেখেছে। কেন হলো? বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন উঠলো। পৃথিবীর সামনে মৃত্যুর ডাক।

রণধীর সুব্বা ছুটে এলেন নন্দিতাদেবীর কাছে।

ম্যাডাম! প্রথম লেসার রশ্মি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

হ্যাঁ। আমি আগেই জানি তা হবে। আপনি মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখুন।

গ্রহাণুতে কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে।

কই দেখি!

সুব্বা যখন ছাঙ্গু মানমন্দিরে মাইক্রোস্কোপে গ্রহাণুটিকে লক্ষ করছিলেন, নাসা, ক্যালিফোর্নিয়া, কিয়োডো, বেজিং, সিডনি সর্বত্রই বিজ্ঞানীরা ধাঁধায় পড়ে গেলেন। কারণ দ্বিতীয় লেসার ফোকাসিং-ও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। বিশ্বের নানা জায়গায় আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ গণ হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে, খবর পাওয়া গেলো। মায়েরা সন্তানদের বুকে করে নিয়ে ছুটছেন। পাতাল রেলের স্টেশনে দলে দলে নামতে গিয়ে বিভিন্ন শহরে বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। বহু লোক শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে হাঁটা দিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ স্যাটেলাইট চ্যানেল থেকে বার বার মানুষকে আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও লক্ষ কোটি মানুষের আতঙ্ক আর পাগলামি ঠেকানো যাচ্ছে না।

ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিট। তৃতীয় সৌরপাল যানের রোবোট নিখুঁত সতর্কতায় গ্রহাণুর পূর্বগতির হিসাব কম্পিউটারে মিলিয়ে পরমাণু বোমা ছুড়লো। বিজ্ঞানীদেব উৎকণ্ঠা চরমে। এবার যদি না লাগে, তবে কী হবে? অতি-অবিশ্বাসীও ভগবানকে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে না?

কী হলো! দূর সংযোগকারি উপগ্রহবার্তা খবর পাঠালো, পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে।

তাহলে 'দু'হাজার আটানব্বই-এক্স' ধ্বংস হলো শেষ পর্যন্ত।

না। তৃতীয় সৌরপাল যানই মহাশূন্যের পরমাণু বিস্ফোরণের রেডিও অ্যাকটিভিটিতে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল হতচকিত হয়ে গেল এই খবরে।

ছাঙ্গু মানমন্দিরে নন্দিতা ভুটিয়া রণধীর সুব্বাকে বললেন, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরাও কি গণহিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত! আশ্চর্য!

ম্যাডাম, ব্যাপারটা আশ্চর্যের নয়। কার্যত তাই হয়েছে।

ছাঙ্গু মানমন্দির থেকে তক্ষুণি একটা উপগ্রহ মেসেজ ছুটলো পৃথিবীর ১৪২টি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে।

২০৯৮ সালের ২৮শে অক্টোবর। রাত্রি ৮টার নির্দিষ্ট নিউজ টাইম এখন ইন্টারন্যাশনাল স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেলে। পর্দায় সংবাদপাঠিকা রেবেকা ম্যান্ডেলা।

হ্যালো, গুড ইভনিং! খবরের শুরুতে জানাই, গত দু'সপ্তাহ যাবৎ যে গ্রহাণুটি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছিলো, সেটিকে ধ্বংস করা যায়নি। কারণ

'সেটি শনিগ্রহের বলয়ের কাছাকাছি এসে গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ওটি সৌরলোকের বাইরে চলে যাচ্ছে। রেবেকা ম্যান্ডেলার চোখেমুখে অনাবিল হাসি। যে বিশিষ্ট মহাকাশবিজ্ঞানী এই গ্রহাণুর আবিষ্কর্তা, সেই নন্দিতা ভুটিয়াই এর গতি পরিবর্তন বুঝতে পেরে বিশ্বের সমস্ত মানমন্দিরে তা জানিয়ে দেন।

পাঁচ

সারারাত ঘুমোতে পারেননি নন্দিতা ভুটিয়া। বিছানায় ছটফট করেছেন। উঠে বসেছেন। না! ঘুম আসছে না। এখনও মধ্যরাত। টয়লেটে গিয়ে এই মধ্যরাতেই উষ্ণজলে স্নান করলেন উনি। বেশ আরাম পেলেন। পোশাক পাল্টালেন। কফি তৈরি করলেন। খেলেন। এখন ভোর চারটে। সোজা চলে গেলেন ছাদে। পূর্ব আকাশ ক্রমশঃ ফর্সা হচ্ছিলো। ছাদে একটা ফাইবারের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলেন নন্দিতা দেবী। অনেকক্ষণ। এখন ৫টা বেজে ২৫ মিনিট। হাত ঘড়িতে সঙ্কেত—বিপ- বিপ-বিপ-বিপ। বোতামটা টিপলেন। ডক্টর বাৎসায়ন চ্যাটার্জির গলা।

হ্যালো নন্দিতা, খবর পেয়েছো?

কী খবর স্যার?

আন্তর্জাতিক মহাকাশ বিজ্ঞান কমিটি ওই নতুন গ্রহাণুর নাম রেখেছে 'নন্দিতা'।

তাই নাকি! দারুণ খবর স্যার! আপনাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ খবরটা দেবার জন্য।

তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখলাম। ছাড়ছি। পরে কথা হবে। রিল্যাক্স করো।

তখন সুর্য উঠেছে পূর্ব আকাশে। নন্দিতা দেবী উঠে দাঁড়ালেন। চুলগুলো উড়ছিলো বাতাসে। ঠাণ্ডা এখন কম নয় ছাঙ্গুতে। তবুও সকালের সূর্যকিরণে তাঁর পরনের কমলা রঙের শাড়িটায় যেন আগুন। চোখে মুখে তাঁর কমনীয় স্নিগ্ধতা।